সাম্যবাদ

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী জীবন ও সংগ্রামের কিছু দিক ৩

কোরবানির চামড়ার দাম লাভের নেশা ধর্ম মানে না ৪

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ঝিলপাড় বস্তিতে ত্রাণ বিতরণ ৫

রোহিঙ্গা সংকট: আগে দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক করা জরুরি ৮

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, মূল্য ৫ টাকা

সমুদ্রের গ্যাস নিয়ে নতুন পিএসসি

আমদানির কথা বলে গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো, অথচ রপ্তানির সুযোগ রেখে চুক্তি

সমুদ্রের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য বিদেশি কোম্পানির দরপত্র আহ্বান করা হয়। এক্ষেত্রে যে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (পিএসসি) তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ওই কোম্পানিগুলো আমাদের সমুদ্রে গ্যাস পেলে উত্তোলন করে তা বাইরে বিক্রি করতে পারবে–এই সুযোগ রাখা হয়েছে। ২০০৮ সালে রপ্তানির বিধান রেখে পিএসসি তৈরি করা হয়েছিল। এটি অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা কমিটির অর্থনীতি বিভাগ। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ–বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার রপ্তানি থেকে পিছিয়ে আসে। বিশ-পঁচিশ বছর পরে এসে প্রমাণ হয়েছে, রপ্তানি না করার সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক।

দশ বছর পরে এসে আবার এখন নতুন পিএসসি করা হচ্ছে রপ্তানির বিধান রেখে। তখন যে যুক্তিতে স্থলভাগের গ্যাস রপ্তানির কথা বলা হয়েছিল, এখন আবার প্রায় একই রকম যুক্তি দিয়ে সমুদ্রের গ্যাস রপ্তানির কথা বলা হচ্ছে। ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলি স্টার' এ ব্যাপারে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এবং বুয়েটের পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ কৌশল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ম. তামিমের সাক্ষাৎকার নেয়। অনেকগুলো যুক্তি-তর্ক সেখানে আসে। আমরা সেই সাক্ষাৎকারের প্রধান প্রধান অংশগুলোর তুলনামূলক চিত্র পাশাপাশি তুলে ধরছি।

আনু মুহাম্মদ

এই পিএসসিতে তো বলা হচ্ছে–প্রথমে পেট্রোবাংলাকে বলা হবে গ্যাস কেনার জন্যে। তারা না কিনলে পরে তা রপ্তানি করা হবে। পেট্রোবাংলা যদি গ্যাস কেনে, তাহলে তো আর রপ্তানির প্রসঙ্গ আসছে না। আপনারা বিরোধিতা করছেন কেন?–"এই ধারাটি অনেক আগেও ছিল। এটা হচ্ছে লোক দেখানো ধারা। পেট্রোবাংলা গ্যাস কিনতে চাইবে কি চাইবে না–সেটাতো নির্ধারিত হবে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন এবং সরকারের মধ্যে যারা আছেন তাদের ওপরে। আমরা দেখি–পেট্রোবাংলায় যাদের বসানো ২ এর পাতায় দেখুন

ম.তামিম

গ্যাস রপ্তানি হচ্ছে দ্বিতীয় অপশন। প্রথম অপশন হচ্ছে, বাংলাদেশ গ্যাস তুলবে। বাংলাদেশ যদি গ্যাস কেনে, তাহলে দ্বিতীয় অপশনটি আর কাজে লাগবে না। বাংলাদেশের গ্যাস কেনার অধিকার আছে। বাংলাদেশ যদি বলে আমরা গ্যাস কিনব, তাহলে কোম্পানি কোথাও গ্যাস বিক্রি করতে পারবে না। বাংলাদেশ যদি গ্যাস না কেনে, তাহলে কোম্পানিগুলোকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, তারা তখন গ্যাস রপ্তানি করতে পারবে। সরকার যদি দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় তাহলে একটা শর্ত দিয়েই এই চুক্তি করতে ২ এর পাতায় দেখুন

" ... কিছু কমরেড আছেন যারা দলের সামগ্রিক স্বার্থ না দেখে কেবল অংশবিশেষের স্বার্থ দেখেন। তারা সর্বদাই দলের কাজের সেই অংশের উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেন যে কাজের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত এবং তাদের নিজের কাজের সেই অংশটুকুর তুলনায় দলের সামগ্রিক স্বার্থকে তারা গৌণ করে দেখতে চান। দলের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতিটি তারা বোঝেন না। তারা উপলব্ধি করেন না যে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন কেবলমাত্র গণতন্ত্র নয়, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন কেন্দ্রিকতার। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যে প্রক্রিয়া, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের, উচ্চতর স্তরের প্রতি নিম্নতর স্তরের, সমগ্রের প্রতি অংশের এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি সকল সদস্যের আনুগত্য বাধ্যতামূলক–সেই প্রক্রিয়াই তারা ভুলে যান। ... দলের প্রতিটি সদস্য, কাজের প্রতিটি শাখা, প্রতিটি বক্তব্য এবং প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে দলের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই নীতির লঙ্ঘন কোনমতেই চলতে দেয়া যায় না। এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যারা গুরুত্ব দেন, তারা সাধারণত 'আমি আগে' এই তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত। বলাবাহুল্য ব্যক্তি ও দলের সম্পর্কের প্রশ্নে এই চিন্তা ভ্রান্ত। যদিও মুখে দলের প্রতি শ্রদ্ধা তারা জোরের সাথেই ঘোষণা করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা নিজেকে প্রথম ও পার্টিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখেন। " ('পার্টির কর্মপদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত রাখুন' বক্তৃতার অংশবিশেষ)

(৯ সেপ্টেম্বর সর্বহারার মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ'-এর ৪৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী। মহান নেতার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোকে আমরা স্মরণ করি)

আসামের নাগরিকপঞ্জি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হবে

——— কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, আসামের চূড়ান্ত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯ লাখ লোক এই নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ পড়েছেন। আসামের রাজনীতিতে বিজেপি, কংগ্রেস, আসু সকলেই 'বঙ্গাল খেদাও' নামে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন করেছে। এরই ফলাফল এই এনআরসি। ভারতের সকল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার আহবান জানাচ্ছি।

এনআরসি থেকে বাদ পড়া লোকেরা 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে' আপিল করতে পারবেন। সেখানে ব্যর্থ হলে হাইকোর্ট, পরে সুপ্রীম কোর্টেও যেতে পারবেন।ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে ৪০ হাজার রুপি খরচ হবে, ফলে বোঝাই যায় গরীব মানুষদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার কোনো উপায় থাকবে না। আমরা মনে করি, নাগরিকপঞ্জিতে বাদ পড়া এই বিরাট সংখ্যক লোকেদের বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে ভারত সরকার। এতে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ উদ্বাস্তু হবে, রাস্তায় মারা পড়বে, কারাগারে বন্দি হবে, সর্বোপরি এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও বাড়বে। এমনিতেই বিজেপি শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে ভারতে দীর্ঘদিন ধরে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব বেড়েছে। আসামের নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত সমাধানের পর তা আরও বাড়বে।

আমাদের দেশের সরকার চোখ বন্ধ করে ভারত সরকারের সকল কাজের সমর্থন করছেন। আমরা এই সরকারের কাছে বিপ্লবী কোনো ভূমিকা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সীমান্তে ঘটে চলা এ ধরনের বড় ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে যে সংবেদশীলতা ও প্রতিক্রিয়া থাকা দরকার আমরা তাদের মধ্যে তা দেখতে পাচ্ছি না। বরং তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীরা ২ এর পাতায় দেখুন

কাশ্মীর প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা

বিজেপি সরকারের পরামর্শে ভারতের রাষ্ট্রপতির আকস্মিক এক ঘোষণার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের জন্য প্রযোজ্য সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হলো, জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করা হলো এবং জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নামিয়ে আনা হলো। শুধু তাই-ই নয়, বিশাল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করে কাশ্মীরকে একটা ইস্পাতের চাদরে মুড়ে ফেলা হলো। মোবাইল, ইন্টারনেট, টিভি সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, লাগাতার কারফিউ জারি করে কাশ্মীরের জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়া হলো। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, কাশ্মীরের জনগণের উপর অত্যাচার চলছে এবং দেশ ও বিদেশের নানান মহল থেকে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখন ভারত সরকার কোনো উত্তর দিচ্ছে না। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের গৃহবন্দি করে কাশ্মীরে একটা যুদ্ধাবস্থা জারি করা হলো এবং সেটা সরকারের দিক থেকেই। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশেও এসে পড়েছে। এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরের উপর চলতে থাকা ভারত সরকারের দমন-পীড়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভও হয়েছে। আবার কাশ্মীরের বেশ কিছু শিক্ষার্থী আমাদের দেশের বড় বড় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া করে। এ ঘটনার পর তারা সংগঠিত হয়ে ঢাকায় একটি মিছিলও করেছে। ঢাকায় বাম ছাত্রসংগঠনগুলো ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে। সব মিলিয়ে কাশ্মীর ইস্যুটি এ সময়ে বেশ আলোচিত ও সংবেদনশীল। আবার একথাও সত্য যে, কাশ্মীরের বাস্তব পরিস্থিতি কী, কেন এমন হলো, সমাধানের রাস্তা কী–এ নিয়ে খুব স্পষ্ট বক্তব্য রাজনৈতিক মহলগুলো থেকে খুব একটা পাওয়া যায়নি, অন্তত আমাদের চোখে পড়েনি। কাশ্মীর ইস্যু অনেক বিস্তৃত। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেকগুলো তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা করে এগোতে হয়। একটা ক্ষুদ্র পরিসরের নিবন্ধে এটা সম্ভব নয়। তারপরও এ নিবন্ধে আমরা মূল বিষয়গুলোর উপর মোটাদাগে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

প্রেক্ষাপট

ভারত ও পাকিস্তানের জন্মকালীন কিছু অসঙ্গতি না জানলে এ আলোচনা শুরু করা যাবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানের বিরাট ও মহৎ ইতিহাস থাকলেও তৎকালীন আপোসকামী নেতৃত্বের কারণে ভারতের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত হয় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে, গঠিত হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র। গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে বসেন এলাকা ও সীমানা নিয়ে। বাস্তবে স্বাধীনতার সকল আয়োজন শাসক প্রভুই করেন, সবাই নিজেদের অংশ গোছানোর জন্য প্রতিদিন তার দরজায় এসে দাঁড়ান।

সে সময় এ উপমহাদেশে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির ৫৬২টি রাজ্য (Princely states) ছিল। এরমধ্যে ১৪০টি রাজ্য ছিল পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন। জম্মু ও কাশ্মীর ছিল দেশীয় রাজা শাসিত–এরকমই একটি রাজ্য।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মতো এই রাজ্যগুলোর রাজারাও বসেন মাউন্টব্যাটেনের সাথে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে দুটি দেশে বিভক্ত হওয়ার পরও মাউন্টব্যাটেনের তদারকিতে এই রাজ্যগুলো নিয়ে সওয়াল চলতে থাকে। মাউন্টব্যাটেন তখন ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষের ভাইসরয় থেকে স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়েছেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি সে দায়িত্বে ছিলেন। তখন ভারত স্বাধীন কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় হলো দেশের রাজা চতুর্থ জর্জ, গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন এবং প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু। এই প্রেক্ষাপটে দেশীয় পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যগুলো ভারত কিংবা পাকিস্তান কার সাথে যুক্ত হবে, নাকি স্বাধীন থাকবে এটা নিয়ে রাজারা একবার মাউন্টব্যাটেনের সাথে, একবার নেহেরুর সাথে, একবার জিন্নাহ্‌র সাথে বসেছেন। জটিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যগুলোর সামনে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর অন্তর্গত 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন (অন্তর্ভুক্তি দলিল)' অনুযায়ী তিনটি রাস্তা খোলা ছিল। তারা ভারতের সাথে কিংবা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবেন, নয়তো তৃতীয় পথ নেবেন। অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্য হিসেবে অবস্থান করবেন।

এসময়ে ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদের মহারাজা শাসিত সরকারগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কাশ্মীরের রাজা হরি সিংও একই পথে যাওয়ার কথাই ভাবছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকরা প্রমাদ গুনলেন। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই জাতীয় রাষ্ট্রের পাশাপাশি নানা স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের অবস্থান তাদের মেনে নিতে হবে–এই সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন জন্ম নেওয়া দেশ দুটির শাসকবৃন্দ দুটো কাজ করলেন। এক, রাজ্যগুলোর সাথে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তি করার চেষ্টা করলেন। দুই, বুঝিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি বলপ্রয়োগের রাস্তাও অবলম্বন করলেন। ৭ এর পাতায় দেখুন

আনু মুহাম্মদ

হয় তাদের মূল ভূমিকা হচ্ছে পেট্রোবাংলাকে শক্তিশালী করার চাইতে বিদেশি কোম্পানিকে সার্ভিস দেওয়া। যে কারণে দেখি যে, স্থলভাগে বাপেক্সের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাপেক্স যে দামে কাজ করতে পারে, তার চেয়ে দুই-তিনগুণ বেশি দামে বিদেশি কোম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়। "আসলে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনেকখানি বিদেশি কোম্পানির মুখপাত্রের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিংবা বাংলাদেশে তাদের জনসংযোগ কর্মকর্তার ভূমিকা মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকর্তা পালন করছেন। সেটাই হচ্ছে বিপদের কথা। পিএসসি চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর গ্যাস তুলতে যে খরচ হবে বা গ্যাসের যে দাম দাঁড়াবে, তখন দেখা যাবে, আমাদের গ্যাসই দেশের ভেতরে নিয়ে আসাটা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। তখন তারা যুক্তি দিবে যে, সেই গ্যাস রপ্তানি করে দেওয়াই ভালো। আবার সেই রপ্তানির টাকা যে বাংলাদেশে আসবে তাও কিন্তু নয়। অংশীদারত্ব এমন পর্যায়ে যাবে যে, সেই টাকাটাও বিদেশি কোম্পানি পাবে। কিছু লোককে সুবিধা দিতে গ্যাস সম্পদ পুরোপুরিভাবে হারানোর জন্যেই এমন চুক্তি করা হচ্ছে।"

▫ প্রতিবারই দেখেছি যে পিএসসি প্রণয়ন করার সময় স্বচ্ছতা, দেশের স্বার্থ নিশ্চিত, দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল বা পরিণতি পর্যালোচনা করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটি প্রণীত হয় যেসব সংস্থা সুবিধাভোগী হবে তাদের প্রস্তাবিত মডেল অনুযায়ী।

▫ সব সময়ই আমাদের বক্তব্য ছিল পিএসসির এই মডেল বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নয়। ২০০৮ সালের পিএসসি মডেলে রপ্তানির বিধান রাখা হয়েছিল। আমরা তখন এর পর্যালোচনা করে দেখিয়েছি যে, রপ্তানির বিধান থাকলে এবং বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে সুযোগগুলো রাখা হয়েছে তাতে শতকরা ৮০ ভাগ গ্যাস বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হবে। আর যে ২০ ভাগ থাকবে তা গভীরসমুদ্র থেকে দেশে এনে ব্যবহার করার জন্যে যে খরচ পড়বে, তা ভায়াবল হবে না। সেসময় আন্দোলনের মুখে রপ্তানির ধারা স্থগিত রাখা হয়েছিল।

▫ পূর্বের পিএসসিতে আন্দোলনের চাপে রপ্তানির বিধান না রাখলেও পরবর্তীতে দেখা যায়, তা সংশোধন করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্যে সুযোগ-সুবিধা অন্যদিকে বাড়ানো হয়েছে। যেমন, গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। দেখা যায়–আমদানি করলে গ্যাসের যে দাম পড়বে, উত্তোলনকারী কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস কিনতে হবে তার চেয়ে বেশি দামে।

▫ আর নতুন পিএসসিতে গ্যাসের দাম তো বাড়ানো হয়েছেই, তাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, তাদেরকে রপ্তানির সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

▫ বাংলাদেশে গ্যাস সংকটের কথা বলেই কিন্তু এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। এই গ্যাস সংকটের কথা বলেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে। গ্যাস সংকটের কথা বলে একদিকে প্রাণ-পরিবেশ বিনাশী বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হবে, এলএনজি আমদানি করা হবে, আবার অন্যদিকে গ্যাস রপ্তানির চুক্তি হবে–তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

▫ পিএসসির মাধ্যমে যে দাম ধরা হচ্ছে, তাতে দেখা যাবে গ্যাস আমদানি করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। এর মানে হলো, আমাদের গ্যাস বিদেশি কোম্পানি ও তাদের সহযোগীদের মুনাফা বাড়াবে। দেশের কোনো কাজে লাগবে না। আবার অনেক বেশি দামে আমাদের এলএনজি আমদানি করতে হবে এবং সুন্দরবনসহ দেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে। এরকম একটা জালের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যার অংশ হচ্ছে এই পিএসসি।

▫ বাংলাদেশের জন্যে যেটা প্রয়োজন তা হলো–জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানো এবং বাপেক্সের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। বাংলাদেশের স্থলভাগে বাপেক্স যে দক্ষতা দেখিয়েছে, সেটাকে হিসাবে নিয়ে তা আরও সম্প্রসারিত করে সমুদ্রে অনুসন্ধানে বাপেক্সকে সুযোগ দেওয়া হোক। সেখানে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তাহলে আমরা সেসব ক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্ট দিতে পারি বা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিতে পারি। কিন্তু, মালিকানা শতভাগ দেশের হাতে থাকা উচিত। শতভাগ গ্যাস যাতে দেশের ভেতর ব্যবহৃত হয় সেটার জন্যে জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

▫ জাতীয় সক্ষমতা ও জাতীয় মালিকানা থাকলে যা হয়–আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস উত্তোলন করতে পারি। আমাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবস্থাকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাজাতে পারি। কিন্তু, তা বিদেশি কোম্পানির মালিকানায় থাকলে তারা তাদের লাভ সর্বোচ্চ পর্যায়ে করার জন্যে কোনো কোনো সময় খুব বেশি মাত্রায় গ্যাস উত্তোলন করতে পারে, আবার কখনও কখনও তা ফেলে রাখতে পারে। আবার কখনও কখনও তাদের অনুসন্ধানের কাজ স্থগিত রেখে শেয়ারবাজারে দাম বাড়িয়ে চলেও যেতে পারে। এমন ঘটনা আমরা অতীতে দেখেছি।

▫ আরেকটি বিষয় হলো: গ্যাসক্ষেত্র দেশের মালিকানায় থাকলে তা আমরা যে দামে পেতে পারি বা দেশের পুরো অর্থনীতি যে সুফল পাবে, তা বিদেশি মালিকানায় থাকলে পাওয়া যায় না। বিদেশি মালিকানায় থাকলে গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে যায়, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যায় এবং নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়। গ্যাস ও খনিজসম্পদ হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার একটি অংশ। এর উপরে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা থাকাটা শুধু জ্বালানি নিরাপত্তা নয়, জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে অপরিহার্য।

▫ আন্তর্জাতিক অঙ্গণে নাইজেরিয়ার ঘটনা আমরা বিবেচনা করতে পারি। নাইজেরিয়ার ক্ষমতাসীনরা নিজেদের সুবিধার জন্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে সুবিধা দিয়ে চুক্তি করেছিল। ফলে কোম্পানিগুলো গ্যাস-তেল উত্তোলন ও রপ্তানি করে লাভবান হয়েছে। বিপুল পরিমাণ তেল-গ্যাস থাকা সত্ত্বেও নাইজেরিয়ার কোনো লাভ হয়নি। একই রকম চুক্তি করেছিল ল্যাটিন আমেরিকার দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলো। হুগো শাভেজ যুগে ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডরসহ অনেক দেশ চুক্তিগুলো বাতিল করে দেয়। গ্যাস-তেল সম্পদের মালিকানা দেশের হাতে নিয়ে নেয়। পৃথিবীতে এমন উদাহরণ থাকার পরও আমাদের সম্পদের মালিকানা বহুজাতিক কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের সম্পদের উপর আমাদের অধিকার থাকছে না।

▫ এর মধ্যে রপ্তানির সুযোগটি হচ্ছে বিপদজনক। অনেকদিন থেকে কথা হচ্ছিলো আমাদের একটি সিসমিক সার্ভে হবে। এই সার্ভে করার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। অথবা দরকার হলে কোনো কোম্পানি ভাড়া করেও করা যায়। দেশি-বিদেশি সমীক্ষা অনুযায়ী সাগরে বেশ ভালো পরিমাণে গ্যাস মজুদ রয়েছে। সেই গ্যাস দিয়ে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা বা শিল্পকারখানা চালানো যায়।

▫ বিদেশি কোম্পানিগুলো যদি অনুসন্ধান–উত্তোলনে খরচ বেশি করে দেখায়, তাহলে দেখা যাবে খরচ অংশীদারত্ব দেখাতে দেখাতে গ্যাসই শেষ হয়ে যায়। কোম্পানিগুলো যারা গ্যাস রপ্তানি করবে, তারা তাদের অংশ রপ্তানি করবে। সেগুলোর কোনোকিছুই আমাদের অর্থনীতিতে যোগ হবে না। কিন্তু, গ্যাসটা বিদেশে চলে যাবে। আমাদের স্থলভাগের গ্যাসের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ আছে।

▫ পেট্রোবাংলা যেসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেসময়ে প্রতিষ্ঠিত অনেক সংস্থা এখন আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করছে। যেমন মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস। বিদেশি কোম্পানিগুলো যারা বাংলাদেশে কাজ করছে, তারা বাংলাদেশের মানুষদের নিয়ে কাজ করছে। অনেক সময় তারা সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়। দেশি কোম্পানির যে সক্ষমতা রয়েছে, তা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার চাইতে বিদেশি কোম্পানির কর্মচারী বা সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর ফলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হচ্ছে। গ্যাস সম্পদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে। গ্যাস সংকটের কথা বলে অনেক বিপদজনক প্রকল্প যেমন কয়লাভিত্তিক বা পারমাণবিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে।"

▫ স্থলভাগে ক্ষেত্রে বাপেক্স তো সম্পূর্ণ শক্তিশালী। তারপরও স্থলভাগের কাজ বাপেক্সকে দিয়ে না করিয়ে বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে করানো হচ্ছে। সক্ষমতা তো একদিনে তৈরি হয় না। সক্ষমতা তৈরি করতে তাকে সময় দিতে হয়, বরাদ্ধ দিতে হয়। খনিজসম্পদ অনুসন্ধান-উত্তোলনে বাজেট বরাদ্ধ খুবই কম থাকে। আবার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল বা অন্যান্য তহবিলে যে অর্থ রয়েছে, সেগুলো বাপেক্সের কাজে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়নি। সেই টাকাগুলো পেট্রোবাংলা বা জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে তার হিসাব নেই। বাপেক্সের সক্ষমতা যেটা আছে, সেটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। সেটাকে বিকশিত করার জন্যে যেসব উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেটাও নেওয়া হচ্ছে না। ... "গ্যাস অনুসন্ধানের কথা যখন বলি সবসময়ই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়–আমাদের সক্ষমতা নেই। কিন্তু, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করার ক্ষেত্রে সরকার একথা বলে না। তখন সরকার বলে–আমরা দক্ষতা তৈরি করে নিচ্ছি। তাহলে গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দক্ষতা তৈরির কথা আসে না কেন?"

▫ সমুদ্রে কাজ করার বিষয়ে বাপেক্সের তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাহলে প্রক্রিয়াটি কি দীর্ঘমেয়াদী হয়ে যেতে পারে?–"না, তা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। সমুদ্রে বাপেক্সের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু, গ্যাস অনুসন্ধান-উত্তোলনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০০৮ সালে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম–পেট্রোবাংলা-বাপেক্সের মালিকানায় অনুসন্ধান করা হোক। প্রয়োজনে কাউকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া হোক। তখন তাদের দক্ষতা নেই বলে তাড়াহুড়া দেখানো হয়েছিল। গত ১১ বছরে বাপেক্সকে শক্তিশালী করা হয়নি। বাপেক্সকে যদি সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যেত যে, বাপেক্সের দক্ষতার যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব।"

▫ পিএসসি করাই হচ্ছে কিছু বিদেশি কোম্পানির নির্দেশনায় তাদের স্বার্থ এবং দেশে তাদের কমিশনভোগী যারা আছেন, তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। দেশের স্বার্থ চিন্তা করলে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

ম.তামিম

পারে যে, যেখানে, যতো গ্যাস পাওয়া যাবে সরকার সব গ্যাস কিনবে। গ্যারান্টি থাকতে হবে। তাহলে কোম্পানিগুলোর আপত্তি থাকবে না। কারণ, কোম্পানিগুলো তাদের গ্যাস বিক্রি করতে চায়। কে গ্যাস কিনলো তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই।

▫ সমুদ্রে অনুসন্ধানের কাজে কোম্পানিগুলো বিশাল আর্থিক ঝুঁকি নিচ্ছে। যদি তারা গ্যাস না পায় তারা যা বিনিয়োগ করবে সব তাদের গচ্চা যাবে। একটা পয়সাও তারা ফেরত পাবে না। আর যদি পায়, তখন তার যে খরচ হয়েছে তার হিসাব রাখবে তখন তাদেরকে সেই টাকাটা শোধ করে দিতে হবে।

▫ সেই অনুসন্ধানের কাজ যদি ওরা না করত, তাহলে তো আমাদেরকে করতে হতো। আমরা সেটা করলে আমাদেরও সেই খরচটা লাগত। যদি তারা গ্যাস না পায় তাহলে আমাদের এক পয়সাও দিতে হচ্ছে না। এই ঝুঁকিটা তাদের। এটা হচ্ছে পিএসসির মৌলিক দিক। তারপর, যেহেতু সে ঝুঁকি নিচ্ছে তার রিকোভারি খরচ বাদ দিয়ে যা থাকবে তাকে আমরা বলি প্রফিট গ্যাস। সেটা ভাগাভাগি হবে।

▫ তারা কতো শতাংশ পাবে? এর জবাবে তিনি বলেন, "সেটা হবে চুক্তিভিত্তিক। যতো বড় আবিষ্কার হবে বাংলাদেশের হিস্যা ততো বেশি হবে। ছোট আবিষ্কার হলে হয়তো দেখা যাবে ওদের খরচই উঠছে না। চুক্তির সবদিক বুঝে কথা বলতে হবে। আমার দৃষ্টিতে–যারা কথা বলছেন তাদের অনেকেই রাজনৈতিক কারণে কথা বলছেন।

▫ গভীর সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলনের পর তা পাইপলাইনে করে আনতে হবে। এর যে খরচ তার চেয়ে এলএনজি আমদানির খরচ কম পড়তে পারে। তাহলে আমি কেনো গ্যাস কিনতে যাব? তখন রপ্তানির টাকা দিয়ে কম খরচে এলএনজি কেনা যাবে। অনেক রকমের পরিস্থিতি হতে পারে। যদি বেশি পরিমাণের গ্যাস পাওয়া যায়, তাহলে তা পুরোটা ব্যবহার করার সুযোগ বাংলাদেশে থাকবে না। তাহলে তারা কি বসে থাকবে? আমি বলতে চাই, কোম্পানিগুলোকে আকর্ষণ করার জন্যে আমাদের চুক্তিতে যদিও গ্যাস রপ্তানির কথা বলা রয়েছে, বাস্তবে গ্যাস রপ্তানির পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি দেখা যায়, আমাদের ভালো স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গ্যাস রপ্তানি করা হচ্ছে, তখন আন্দোলন করে তা বন্ধ করা যেতে পারে।

▫ এখানে উৎপাদিত গ্যাসের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম কম হলে তখন?–"আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যখনই কমে, তখনই হাই ফার্নেস ওয়েলের দামও কমে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম উঠা-নামা করলে আমাদের এখানেও দাম উঠা-নামা করবে।"

▫ এখন যে চুক্তি রয়েছে তাতে বলা আছে–যেহেতু আমরা নিজেরা জরিপ করিনি, ওরা গভীর সমুদ্রে প্রথমে তিন বছর জরিপ করবে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আমরা যদি নন-এক্সক্লুসিভ মাল্টিপার্টি সার্ভেটা করতে পারতাম, ২০১৪ সালের পর তা করার কথা ছিল, যেহেতু ২০১৪ সালে সমুদ্রসীমা হয়ে গিয়েছিল। এখন আমরা ব্লক করে দিয়েছি। বলছি, তোমরা আগে সার্ভে করো। এর মানে তিন বছর আমরা আটকে যাচ্ছি। তারপর তারা জানাবে খনন করার সুযোগ আছে কি না। যদি তারা বলে যে, তারা খনন করবে, তখন তাদেরকে দুই বছর সময় বাড়ানো হবে। সেই সময়ের মধ্যে তারা অন্তত একটা কূপ খনন করবে।"

▫ এই খরচগুলো তারাই চালিয়ে যাবে?–"হ্যাঁ, অবশ্যই। আর তিন বছর পর তারা যদি বলে, না আমি এখানে ইন্টারেস্টেড না, তাহলে সে চলে যাবে। এটা আমাদের কেন করতে হয়েছে? কারণ, আমাদের হাতে তথ্য নেই। যদি তথ্য থাকত, তাহলে সেই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আমাদের হিস্যাটা আরেকটু ভালো পেতাম। তখন আমরা গ্যাসের মূল্য থেকে শুরু করে হিস্যা বা সবকিছু আরও ভালোভাবে নেগোশিয়েট করতে পারতাম। আমরা যদি জানতাম, সেখানে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে ভালো চুক্তি করতে পারতাম। আর যদি দেখতাম সম্ভাবনা নেই, তাহলে কোম্পানিগুলেকে আরও বেশি সুযোগ দিয়ে আকর্ষণ করা যেত। তাই তথ্যের অভাবে আমাদেরকে বর্তমানে আঞ্চলিক ঝুঁকির ভিত্তিতে দিতে হচ্ছে।"

▫ আঞ্চলিক ঝুঁকি বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন?–"যখন আমরা নির্দিষ্ট এলাকা-ভিত্তিক কোনো তথ্য না জানি, তখন ঐ অঞ্চলের আশেপাশে বর্তমান ও পুরনো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সম্ভাবনার পরিমাপ করা হয়। এটা অনেক মোটা দাগের পরিমাপ। তবে বঙ্গোপসাগরে এই আঞ্চলিক ঝুঁকিটা খুব বেশি নয়। এটা মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। তার ভিত্তিতেই এই চুক্তিটা করা হয়েছে। আমাদের হাতে যদি নির্দিষ্ট তথ্য থাকত, তাহলে চিহ্নিত করা যেত কোথায় সম্ভাবনা রয়েছে বা কোথায় কম সম্ভাবনা রয়েছে।

▫ তাহলে কি গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে?–"এই কারণে আমরা এখন যা করছি, তা হলো এলাকা-ভিত্তিক ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে রিওয়ার্ড দিচ্ছি। বিডিং যেটা হবে, সেখানে আমাদের পক্ষে দরকষাকষির খুব একটা সুযোগ থাকবে না। ওরা ওদের লাভের ভাগটা তুলনামূলকভাবে বেশি রেখে বিড করবে। গলদ রয়েছে তা আমি বলব না। আমি বলব, আমরা আরও ভালো করতে পারতাম।"

▫ ২০০৪ সালে এসে পেট্রোবাংলা গ্যাস কেনার কথা জানায়। এর আগেই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে একটি বিদেশি পত্রিকায় খবর ছাপা হয় যে বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে। সেই ইংরেজি আর্টিকেল অনুবাদ করে দেশে প্রকাশ করা হয়। তখন যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষে ছিলেন তারা এই খবরটির উদ্ধৃতি দিতে থাকেন। বাংলাদেশের কোনো বিশেষজ্ঞ বলেননি যে, "বাংলাদেশ গ্যাসের উপর ভাসছে।"

সেসময় আপনার অবস্থান কি ছিল?–"২০০২-২০০৩ সালে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির পরামর্শে বলা হয়েছিল–পুরনো আবিষ্কৃত কোনো গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না। কারণ, বর্তমানে আবিষ্কৃত, বিবিয়ানাসহ যে পরিমাণ গ্যাস রয়েছে, ২০১০ সালের মধ্যে ঘাটতি শুরু হয়ে যাবে। যদি নতুন কোনো ক্ষেত্রে গ্যাস না পাওয়া যায়। কিন্তু, নতুন আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র থেকে যদি বাংলাদেশ না কেনে, তাহলে রপ্তানি করা যাবে। কোম্পানিগুলো যখন দেখবে বাংলাদেশ গ্যাস কিনতে পারছে না, তাহলে তারা কেন নতুন আবিষ্কারের দিকে যাবে? ... তখন আশঙ্কা করা হয়েছিল, যদি আমরা এখন গ্যাস না কিনি কোম্পানিগুলো ডিজহার্টেন্ড হবে। তারা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। তারা আর কোনো এক্সপেন্ডারেশন করবে না। অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাক্সাক্টলি হোয়াট হেপেন্ড। ১৯৯৯-এর পরে বেসিক্যালি বাংলাদেশে আর কোনো এক্সপ্লোরেশন হয়নি। আমরা রপ্তানির কথা বললেই পাগল হয়ে যাই। কারণ, আমরা আমাদের পলিটিশিয়ানদের বিশ্বাস করি না।"

▫ পেট্রোবাংলাকে কি আন্তর্জাতিকমানে তোলা যায় না?–"পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি জ্ঞানের দক্ষতা অবশ্যই আন্তর্জাতিকমানের করা যায়। কিন্তু, হার্ডওয়ার ইনভেস্টমেন্ট করে অনুসন্ধান বা খনন করার সক্ষমতা বাড়ানোর কোনো সুযোগ এখন আর নেই। তাদেরকে অনেক বিনিয়োগ করতে হবে। তাদের ম্যানেজ করার ক্ষমতা অনেক বাড়াতে হবে। সেই সুযোগ আছে। সেটাই আমাদের করা উচিত। পেট্রোনাস বা অন্যরা নিজেরা খুব একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নেই। কিন্তু, বিদেশি কোম্পানিগুলো সঙ্গে চুক্তি করা, তাদের সুপারভাইজ করা ইত্যাদি কাজগুলো খুব ভালো করতে পারে। তাদের সেই প্রশিক্ষণ রয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ও সুপারভিশন স্কিলসম্পন্ন লোকজন আমাদের তৈরি করা উচিত।"

▫ গ্যাস ফিল্ডগুলোর মালিকানা যদি বিদেশি সংস্থাগুলোর হাতে থাকে, তাহলে তো তারা তাদের ইচ্ছামতো গ্যাস তুলতে বা গ্যাস তোলা বন্ধ রাখতে পারবে?–"এই ব্যাপারে আমি ঠিক বলতে পারব না। এ বিষয়ে চুক্তিতে কোথাও কিছু বলা আছে কি না, তা আমি জানি না। কী পরিমাণ রপ্তানি করা যাবে, গ্যাস উত্তোলন কতক্ষণ চলবে, তা বন্ধ করতে পারবে কি না পারবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত এই চুক্তিতে কোথাও নেই।"

▫ যখন বলা হয়, বিদেশিদের কাছে খনিজসম্পদ তুলে দেওয়া শুধু জ্বালানি নিরাপত্তা নয়, তা দেশের নিরাপত্তার জন্যেও হুমকি। তখন বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?–"না, আমি তা মনে করি না। কারণ এ পর্যন্ত আমাদের পিএসসির যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তা খুব ভালো অভিজ্ঞতা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া গ্যাস পেয়ে যাচ্ছি। এ দেশে বিদেশি কোম্পানিগুলো দ্বারা প্রায় ৬০ শতাংশ গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তারা আন্তর্জাতিক মানের নয়।"

পেট্রোবাংলায় সেরকম লোকজন রয়েছে কি?–"আগে ছিলো। এখন আর নাই।"

▫ অনেকের অভিযোগ–বিদেশি কোম্পানিগুলো গ্যাস তুলে তাদের অংশ বিদেশে রপ্তানি করলে গ্যাস ও মুনাফার টাকা দুটোই বিদেশে চলে যাবে। আসলে বাংলাদেশ কিছুই পাবে না। "না, এটা ভুল কথা। পিএসসির গ্যাস ভাগাভাগির অংশীদারত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ অংশের গ্যাসও তারা রপ্তানি করবে আর সেই টাকা বাংলাদেশ পাবে।"

▫ এই চুক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক-ফোকর রয়েছে কি?–"চুক্তির মধ্যে ফাঁক-ফোকর থাকতেই পারে। চুক্তিতে নানারকম ফাঁক-ফোকর থাকে। আমি তো ডিটেল চুক্তি পড়িনি। তাই ঠিক বলতে পারব না।"

▫ এই পিএসসির খারাপ দিকগুলো কী কী বলে আপনি মনে করেন?–"মোটা দাগে চুক্তি ঠিকই আছে।"

আসামের নাগরিকপঞ্জি

জনগণকে ক্রমাগত আশ্বস্ত করছেন যে, এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, আমাদের চিন্তা করার কিছু নেই। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুদিন আগে আমাদের দেশে এসেও একথা বলেছেন। আমরা তার কথায় বিশ্বাস করার কোনো কারণই দেখছি না। উপরন্তু বিজেপি'র আইন সেলের সদস্য ও দলের নেতা বিবেক রেডিড বলেছেন, এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বাংলাদেশ সরকারকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়েছেন, সেটাই শেষ কথা বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ভবিষ্যতে অনেক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যার কোনো সমাধান আজও করতে পারেনি। ভারত সরকার এ প্রশ্নে আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি, বরং ভারত মিয়ানমারের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ করে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে। চূড়ান্তভাবে এনআরসি থেকে বাদ পড়া লোকেদের তারা কী করবে–সেকথা আজও ভারত বলেনি। ফলে বাংলাদেশ সরকার এখন থেকেই সতর্ক না হলে এবং একে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত না করলে এর ফলাফল দেশের জনগণকে ভোগ করতে হবে। এছাড়াও একটি দেশ তার সীমান্ত এলাকার কাছে অপর দেশের ভেতর লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর এই ধরনের প্রহসনে নীরব থাকতে পারে না। ভারত সরকারের বক্তব্যেও আশ্বস্ত হতে পারে না, কারণ সাম্রাজ্যবাদী ভারত কখনওই আমাদের বন্ধু নয়।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী: জীবন ও সংগ্রামের কিছু দিক

(সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী' গ্রন্থের উপসংহার অধ্যায়ের ৬১৭-৬৪৫ পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭৮-১৯০ পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত। অনুচ্ছেদ ভাগ ও শিরোনাম আমাদের।)

পূর্ব প্রকাশের পর

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ভাসানীর ভূমিকা

... আসামে লাইনপ্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং চুয়াল্লর মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলনের পর ১৯৬৮-র নভেম্বরে মওলানা ভাসানী আর একবার জাতীয় রাজনীতির কাণ্ডারীরুপে আবির্ভূত হন। '৬৮-৬৯ সালের সেই আন্দোলনেই ' লৌহ মানব' আইয়ুব খনকে বিদায় নিতে হয়। ইনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় শুধু দেশবাসীর কাছে নয়, বিশ্ববাসীর কাছে ভাসানী পরিণত হলেন এক দুর্বিনীত ব্যক্তিত্বে।

... ৬৮-র শেষ দিকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয় গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে। ... ৬৮-র ৬ ডিসেম্বর পল্টনের এক বিরাট জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, ... স্বায়ত্তশাসন, সার্বজনীন ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ... এসব দাবি মানা না হলে পূর্ব পাকিস্তান 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেই। ... তিনি ... ইঙ্গিত দেন বর্তমান অবস্থায় ন্যাপ আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ নাও করতে পারে। সভার শেষে ভাসানীর নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা গভর্নর হাউসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেকানে পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ হয়। ... ভাসানী পরদিন ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ... ৭ ডিসেম্বর এক অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। ... পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হবার খবরে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে ওয়াকআউট করেন। ... ভাসানী সরকারি নির্যাতনের নিন্দা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোরনের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান ... ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং ১৪৪ ধারার মধ্যেই বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সকল বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদেরসহ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে আগের দিনের নিহতদের গায়েবানা জানাজার ইমামতি করেন মওলানা ভাসানী। ঢাকায় ... চট্টগ্রাম, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি শহরেও পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয়। ... ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ সরকারবিরোদী আণ্দোলনের বার্তা পৌঁছে যায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ভাসানী মফস্বলের বিভিন্ন জায়গা সফর করে জনগণকে বিশেষ করে কৃষক ও পল্লীর শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

... ২৮ ডিসেম্বর ভাসানী ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেন। ওই দিন পাবনায় এক বিশাল জনসভা ... শেষে ভাসানীর নেতৃত্বে এক মিছিল পাবনা জেলা প্রশাসকের বাংলো ঘেরাও করে। ... এই আন্দোলনের প্রাক্কালে ভাসানী শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে গ্রামের জনসাধারণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ... আইয়ুবের দুর্নীতিপরায়ণ মৌলিক গণতন্ত্রী ও গ্রামের মোড়ল মহাজনদের নির্মূল করার লক্ষ্যেই জননেতা উদ্ভাবন করেন নতুন রাজনৈতিক কৌশল : ঘেরাও আন্দোলন। ... ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত মনোহরদীতে বিক্ষোভকারী জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। সেখানে তিনজন নিহত হবার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে ঘেরাও আন্দোলন এক মারাত্মক আকার ধারণ করে।

... ৫ জানুয়ারি বৃহত্তর আন্দোলনের লক্ষ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় (ডাকসু, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ভাসানীপন্থী ও মস্কোপন্থী দুই অংশের সমন্বয়ে)। ১৪ জানুয়ারী তাঁরা ঘোষণা করেন তাঁদের ১১ দফা কর্মসূচি, যা তৎক্ষণাৎ ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পায়। ... ১৭, ১৮, ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং ২০ জানুয়ারি ... পুলিশ ... গুলিতে ভাসানীপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আসাদুজ্জামানকে হত্যা করে, ... ছাত্র আন্দোলন ও ভাসানীর জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও আন্দোলন এক হয়ে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় গণঅভ্যুত্থানে। ... ভাসানী ছাত্রদের এগার দফায় সমর্থন জানিয়েছিলেন।

... ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। ... পরদিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি, পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দানকালে জননেতা বলেন, "প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে নিয়ে আসবো। দুই মাসের মধ্যে ১১ দফা কায়েম এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া না হলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হবে।" ... ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর লোকদের হাতে নিহত হন, ... ১৮ তারিখ ঢাকাতেই সরকারি হিসেবে চারজন নিহত ... সরকারি ও মুসলিম

লীগ নেতাদের বাড়িঘর আক্রমণ করছিলো বিক্ষুব্ধ জনতা। ... উত্তাল আন্দোলনের মুখে সরকার কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে এবং বিনাশর্তে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়। ... মুক্তি পেয়ে ওইদিনই রাতে শেখ মুজিব ভাসানীর সাথে দেখা করেন ... ভাসানী মুজিবকে (আইয়ুবের ডাকা) গোলটেবিলে যেতে বারণ করেন। ... যাইহোক, শেখ মুজিব, ... আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে লাহোর যান। ... ১১ দফার ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ন্যাপ ... আবেদন জানান। ... গোলটেবিল বৈঠকের পরও মওলানা ভাসানীর জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও আন্দোলন অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে। ... কোনক্রমেই আর আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয় ভেবে তিনি ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে এক দীর্ঘ চিঠি দিয়ে তাকে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানান। ... ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারি করা হয়।

... আইয়ুবের পতনে ভাসানী যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন তার জন্য সমগ্র বিশ্বে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সাপ্তাহিক 'টাইম' তাকে 'Prophet of violence' অভিধায় ভূষিত করে। 'টাইম' সাময়িকী লেখে : "... একজন, শুধু একজন মানুষই, গত মাসে (মার্চ ১৯৬৯) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং ' 'লৌহমানব' নামে খ্যাত আইয়ুব খানকে গদিচ্যুত করতে বাধ্য করেছেন। ... তিনিই এখন সেই সামরিক আইনের একমাত্র-একক আতংকস্বরূপ। ভাসানীর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নরমপন্থী শেখ মুজিবুর রহমানসহ পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা একটি ভীতির কারণে নিশ্চুপ। কিন্তু ভাসানী অকুতোভয়। ... " [পৃষ্ঠা ৩১৩-৩৩১]

কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গড়ায় ভাসানী

কৃষকনেতা হিসেবে ভাসানী নিজেই এই দেশে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন ৩০-এর দশক থেকে। উপমহাদেশের অন্য কৃষকনেতার চেয়ে স্বভাবে ও চারিত্রে তিনি ছিলেন ভিন্ন ও ব্যতিক্রমী। কৃষকদের নিয়ে সংগঠন করেন তিনি অনেক পরে, ১৯৫৭ অব্দে, যখন গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি'। এই সমিতি দেশে কৃষক আন্দোলনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। অনেক সংসদীয় গণতন্ত্রী নেতাদের মতো ভাসানী চাতুর্য করে কৃষকদের ভোটের সময় দলে টানবার নীতিকে ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন কৃষকদের আত্মশক্তিতে বলী-য়ান করে তুলতে যাতে সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের নিজেদের দাবি তারা নিজেরাই আদায় করতে পারেন।

বহুকাল যাবৎ কৃষকসমাজের 'রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার' কথা সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় আলোচিত হয়েছে। কৃষকনেতা থেকে যখন রাজনীতিবিদে উত্তরণ ঘটে ভাসানীর তখনো তাঁর ক্ষমতার মূল উৎস ছিলো কৃষকসমাজ। ... ... বিকশিত আধুনিক নাগরিক জীবনের জৌলুস থেকে দূরে বিভিন্ন লোকালয়ে ও জনপদে বিচ্ছিন্ন কৃষকদের কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে একত্রিত করা সহজসাধ্য নয়। ... ... মার্কস-এঙ্গেলস ছোটো কৃষকদের কিভাবে বিপ্লবে ও আন্দোলনে আনা যায় সে বিষয়ে ভেবেছেন, কিন্তু ভাসানী কোনো সমাজবিজ্ঞানের বইপত্র ও অর্থনীতি না পড়ে তাদের সংগঠিত করেছেন শুধু তাঁর উপলব্ধি থেকে। তিনি ছোটো কৃষক ও খেতমজুরদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত আন্দোলনে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ভাসানী জমিদার ব্যবস্থায় মধ্য কৃষক ও প্রান্তিক চাষী ও ভূমিদাসদের দুঃসহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন জমিদারদের ও জোতদারদের তারা দাসবিশেষ। তিনি যে-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাকে সফল করার লক্ষ্যে ... তিনি কৃষকদের বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করতে চেয়েছেন, তাদের চেতনার মান বাড়াতে চেয়েছেন, বরং নির্বাচনে কৃষকদের ব্যবহৃত হতে দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। জীবনের শেষ পঞ্চাশ বছর তিনি আসামের বরপেটায়, ময়মনসিংহে, টাঙ্গাইলে, সিরাজগঞ্জে, পাবনায়, পাকসিতে, নওগাঁতে, মহিপুরে, ঢাকায়, শিবপুরে, ভুরুঙ্গামারিতে প্রভৃতি স্থানে বিশাল বিশাল কৃষক সম্মেলন করেছেন।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সামগ্রিকভাবে কৃষক ও শ্রমিককে সংগ্রামে সম্পৃক্ত করার বিরল কৃতিত্ব তাঁর। তা ছাড়া কৃষকদের মধ্যে পৃথিবীর সর্বাধিক পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পাটচাষীদের সংকট, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ ছিলো সবচেয়ে বেশি। ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত এবং সমস্যায় জর্জরিত পাটচাষীদের দুর্দশাকে আলাদাভাবে সমাধানের জন্য তিনি গড়ে তোলেন 'পূর্ব পাকিস্তান পাটচাষী সমিতি': পাটচাষীদের প্রথম সংগঠন। ৫০ ও ৬০-এর দশকে এই সংগঠনের উদ্যোগে বড় বড় পাটচাষী সম্মেলন করেন।

মৎস্যজীবীদের নিয়ে কে ভেবেছেন এ দেশে তাঁর আগে? তিনি ১৯৫৮-তে গড়ে তোলেন 'পূর্ব পাকিস্তান মৎস্যজীবী সমিতি'। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম এই মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী স্বয়ং এবং এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার। জেলেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে এই সমিতি একটি ১২-দফা দাবিনামা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে, কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই দেশে সামরিক শাসন জারি হয়।

ঢাকাসহ বড় বড় শহরের রিকশাচালকগণ কোনো কারখানার শ্রমিক না হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশ নিতে পারছিলেন না তারা। ৫০-এর মাঝামাঝি ভাসানী ঢাকায় রিকশাচালকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রিকশাচালক সমিতি'। ... ১৯৫৮-তে দেশে সামরিক শাসন জারি না হলে '৫৯ নাগাদ ভাসানী তাঁর নেতৃত্বে তাঁতী সমিতি, কুম্ভকার সমিতি, কর্মকার সমিতি প্রভৃতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে তাতে যোগ হতো নতুন মাত্রা।

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে ভাসানীর অবদান বর্ণনার জন্য বিরাট জায়গার প্রয়োজন। ১৯৫০ পর্যন্ত এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রধানত কমিউনিস্টরাই জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ থেকে '৫৭ পর্যন্ত বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত কোনো শ্রমিক সংগঠন প্রকাশ্যে ছিলো না। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টরাই কলকারখানা, শিল্প এলাকা ও শ্রমিক-বেল্টগুলোয় শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য তাদের সংগঠিত করতেন ও সংগ্রাম করতেন। '৫০ নাগাদ হিন্দু কমিউনিস্টদের অনেকেই দেশত্যাগ করায় শ্রমিক আন্দোলনে শক্তি কমে আসে।' ... ১৯৫৭-তে 'পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন' জন্ম নেয় বামপন্থীদের দ্বারা। ভাসানী ছিলেন এর মুখ্য উপদেষ্টা। এটির সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বরিশালের স্টিমার শ্রমিক-নেতা কাজী মহিউদ্দিন। অসংখ্য বামপন্থী শ্রমিক নেতা এই সংগঠনে ছিলেন। '৫৮-তে সামরিক আইন জারি হলে ফেডারেশনের অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। ... ১৯৬৬-তে গঠিত হয় ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন'। এর নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, সিরাজুল হোসেন খান, মনীন্দ্র মহাজন, অমল সেন, জ্ঞান চক্রবর্তী, কালী চক্রবর্তী, বারীন দত্ত, আবদুস সাত্তার, দেবেন শিকদার, মণিকৃষ্ণ সেন, রওশন আলী, অমূল্য লাহিড়ী, খোকা রায়, কাজী জাফর আহমদ, কাজী মহিউদ্দিন প্রমুখ। '৬৮-তে এই সংগঠন ভাগ হয়ে যায়: এক দলের নেতৃত্বে থাকেন আবুল বাশার, সিরাজুল হোসেন খান প্রমুখ। অন্য দলের নেতৃত্ব দেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো প্রমুখ। এই সকল শ্রমিক সংগঠনের লিখিত বা অলিখিত প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মওলানা ভাসানী। তাছাড়া '৫০-এর দশকে ভাসানী 'আদমজী জুট মিলস মজদুর ইউনিয়নে'র সভাপতি ছিলেন। মোহাম্মদ তোয়াহা ছিলেন সহ-সভাপতি। 'ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়েজ এমপ্লয়িজ লীগ'-এরও মওলানা ছিলেন সভাপতি। দেশের সকল বামপন্থী শ্রমিক-সংগঠনগুলোর তিনি ছিলেন প্রধান অভিভাবক।

গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী ভাসানী

এ দেশের গ্রামের মানুষকে স্পর্শ করে এমন প্রত্যেকটি ব্যাপারে ভাসানী ছিলেন অসামান্য সচেতন। তাদের সুখ-দুঃখের জায়গা তিনি শনাক্ত করতেন পারতেন অতি সহজে। যখন যেখানে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা-বসন্তের প্রাদুর্ভাব হতো, তিনি অবিলম্বে সেখানে যেতেন ছুটে, বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে বা অন্যভাবে প্রশাসনকে ব্যস্ত করে তুলতেন। শুধু মানুষের রোগশোকে নয়, গবাদিপশুর নানা অসুখেও তাঁর তৎপরতা লক্ষ করা যেতো। নদনদীবিধৌত এই দেশের নদীভাঙন সাংবাৎসরিক সমস্যা। ... নদীর দু'তীরের অথবা বালুচরের শ্রমজীবী মানুষগুলোর সঙ্গে ছিলো তাঁর গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক। ... বহু সভা-সমাবেশ তিনি দেশের মানুষের যে সমস্যাসমূহ বারংবার তুলে ধরতেন তার মধ্যে থাকতো নদীসিকস্তি সর্বস্বান্ত মানুষের হাহাকারের কথা, তাঁর ভাষায় : বান তুফান হইলে ঘরবাড়ি জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায়। নদীর ভাঙনে কিছুই থাকে না – ভিটিসহ নদী সব কিছু ভাসাইয়া নিয়া যায়।

এ দেশ যেমন নদনদীর তেমনি বন্যারও। ... এ শতকের ২০, ৩০ ও ৪০-এর দশকে দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। বন্যাউপদ্রুত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ভাসানী। বড় বড় জোতদারের বাড়ি থেকে ধান-চাল-ডাল সংগ্রহ করে তিনি বড় নৌকা নিয়ে যেতেন উপদ্রুত এলাকায়। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে ১৯৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৭০ সালে বাংলাদেশে প্রবল বন্যা হয়। প্রত্যেকটি বন্যার সময় তাঁর তৎপরতা ছিলো যে-কোনো রাজনীতিকের চেয়ে বেশি। ১৯৬২-র বন্যার সময় তিনি ছিলেন অন্তরীণ, বন্যার্তদের পর্যাপ্ত সাহায্যের দাবিতে তিনি অনির্দিষ্টকাল অনশন ঘটলে তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। পরে দেশের রাজনীতিবিদদের চাপে আইয়ুবের সামরিক সরকার তাঁকে চার বছর বন্দী রাখার পর মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি পেয়েই তিনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে যান। দুর্গত মানুষের সেবা ছিলো তাঁর রাজনীতিরই অংশ। ... ... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আসাম থেকে এখানে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি বন্যাসমস্যা সমাধানের কথা বলতে থাকেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে চুয়ান্নর নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অনবরত তিনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে চাপ দিয়েছেন। যুক্তফ্রন্টের বিখ্যাত ২১ দফায় বন্যার প্রসঙ্গ ছিলো। ১৯৫৬ সালে তিনি বন্যা পরবর্তীকালের খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য অনশন ধর্মঘট করেন। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের প্রত্যেকটি কাউন্সিল ও বিশেষ অধিবেশনে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের কথা বারবার উত্থাপন করেছেন। উত্তরবঙ্গে বন্যার সময় জরুরি খাদ্য সরবরাহের জন্য 'উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রস্থল শান্তাহারে একটি বিমানঘাঁটি' (বিমানবন্দর) নির্মাণের প্রস্তাব করেন তিনি মধ্য-৫০-এ।

জীবনে কোনো ব্যাপারেই তিনি শাসকদের সঙ্গে আপোস করেননি তা নয়, পরিস্থিতির কারণে অনেক শাসককে তিনি কোনো ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্যসমস্যার ব্যাপারে তিনি ছিলেন চরম কঠোর। মধ্য ৫০-এ শুধু স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে নয়, পূর্ব বাংলার খাদ্যসমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর গাফিলতির জন্যেও তাঁর সঙ্গে ভাসানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে, পল্টন ময়দানে জনসভায় ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতেই তাঁকে অসৌজন্যমূলক ভাষায় সমালোচনা করেন। প্রাজ্ঞ রাজনীতিক সোহরাওয়ার্দী ভাসানীর ভর্ৎসনায় লজ্জিত বিব্রত হয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে ক্রুদ্ধ হননি। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের খাদ্যের দাবিতেই ভাসানী বারবার অনশন করেছেন। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের আগে '৭৩-এ অনশন করে তিনি সরকারকে সতর্ক করে দেন, কিন্তু সরকার তাঁর হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে। ***চলমান***

কোরবানির চামড়ার দাম: লাভের নেশা ধর্ম মানে না

পোস্তা শুধু ঢাকা নয় দেশের অন্যতম বড় চামড়ার আড়ত। সেখানেই কথা হয় মৌসুমী চামড়া ব্যবসায়ী কাওসার আলীর সাথে। ঈদের দিন ১৩৭টি চামড়া কিনেছেন ৫১ হাজার ৩৭৫ টাকায়। বিক্রি করেছেন ২৮ হাজার ৫০০ টাকায়। গড়ে প্রতিটি চামড়ায় লোকসান ১৬৬ টাকা ৯৭ পয়সা। কিছুক্ষণ কথা বলার পর জানতে চাই, এবার দাম কম কেন? উত্তরে বলেন, "ভাই পুরোটাই লস। প্রথমে ভাবলাম ফালাইয়া দেই–পরে ভাবলাম ফালাইয়া কী লাভ?"

কাওসার আলী একজন উদাহরণ মাত্র, এরকম অসংখ্য কাওসার আলী এই ঈদে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। দাম কমার কারণ জানতে চাইলে মজুতদাররা বলছে, ট্যানারি মালিকরা দাম দিচ্ছে না। আবার ট্যানারি মালিকরা তা অস্বীকার করেছেন। আপাতভাবে তাদের অবস্থান পরস্পরবিরোধী মনে হলেও এক জায়গায় তাদের অবস্থান একই–তা হলো সিন্ডিকেট গড়ে তুলে মৌসুমী ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সস্তায় চামড়া কেনা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছোট ব্যবসায়ীরা কিন্তু লাভবান হয় ট্যানারি মালিক ও আড়তদাররা। এবারের ঈদে এরকম কারসাজির মাধ্যমে কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আড়তদার ও ট্যানারি মালিক পরস্পর দোষারোপ করলেও হিসাবটা একই

চামড়ার স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় শতভাগ। অর্থাৎ এ শিল্প দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর। তা সত্ত্বেও প্রতিবছর কমছে দাম। এ জন্য ট্যানারি মালিক ও আড়তদাররা বিভিন্ন কৃত্রিম সংকটের কথা বললেও এর নেপথ্যে কাজ করছে উভয়ের কারসাজি। আড়তদাররা বলছে ট্যানারি মালিকদের কাছে তাদের পাওনা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এ পাওনা টাকা বছরের পর বছর অনাদায় থাকায় তারা বেশি পরিমাণ চামড়া কিনতে পারেনি। ফলে দামে ধস নেমেছে। 'বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন' (BTA) এ দাবিকে প্রত্যাখান করেছে। ট্যানারি মালিকরা বলছে, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়ার দাম কমে যাওয়ায় ও ব্যাংকগুলো ঋণ না দেওয়ায় তারা বেশি দামে চামড়া কিনতে পারেনি। অথচ চামড়া খাতে ঋণ দেওয়ার নামে চলছে লুটপাট। এ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো যে ঋণ দিয়েছে, তার ৯০ শতাংশই খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, "সার্বিকভাবে চামড়াশিল্পে এখন ব্যাংকের দেওয়া ঋণের পরিমাণ ৭ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা।" এক পর্যায়ে আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংকগুলো ঋণ অবলোপন ঘোষণা করে অর্থাৎ ব্যাংকের মূল হিসেব থেকে বাদ দেয়। এ খাতে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকিং বিধিবিধান ভঙ্গ করা হয়। বেশিরভাগ ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের কাছে কোনো জামানত নেই। খেলাপি গ্রাহকদের বেশিরভাগ কারখানাই বন্ধ, কিছু প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বহীন।

জালিয়াতির ঘটনা নিয়মিত। ঋণের সবচেয়ে বড় জালিয়াতি ঘটে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালে। জনতা ব্যাংক এসময় ক্রিসেন্ট লেদারকলে অবৈধভাবে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়। এর মধ্যে ঋণ দেওয়া হয় ২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, "গত বছরের কোরবানির ঈদে চামড়া সগ্রহের জন্য দেওয়া প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বেশিরভাগই এখনও আদায় হয়নি। এবছর শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি ব্যাংক থেকেই ট্যানারি মালিকদের ৬০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।" কিন্তু আড়তদাররা বলছে, তাদের বকেয়া শোধ হয়নি। তাহলে টাকাগুলো গেল কোথায়?

অনিয়ম-দুর্নীতি সত্ত্বেও এ খাতে প্রতিবছর নতুন ঋণ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে কাঁচা চামড়া কিনতে। গবেষণায় দেখা যায়–এ শিল্পের নামে ঋণ নিলেও তা স্থানান্তর ঘটছে অন্য শিল্পে।

সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়ে ছোট ব্যবসায়ীদের পথে বসিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বা বিক্রয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো

সর্বোচ্চ মুনাফা করা। সেজন্য যা যা করা দরকার, পুঁজির মালিকরা তা-ই করে। কৃষকের উৎপাদিত ধান যেমন কৃষককে উৎপাদনের কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় অথচ খোলা বাজারে চালের আগুন দাম থাকে, তেমনি সবক্ষেত্রেই এটা ঘটে। বড় ব্যবসায়ীদের দাপটে ছোট ও মধ্য ব্যবসায়ী, তারও মধ্যবর্তী স্তরে যুক্ত থাকা অসংখ্য নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ রাস্তায় বসে যায়। কোরবানির চামড়া নিয়ে এই কাণ্ডই ঘটছে। উপরন্তু কোরবানির চামড়া বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ গরুর মালিক নিজে কখনও ব্যয় করেন না। এলাকার দরিদ্র মানুষ, এতিমখানা এসবে এই অর্থ ব্যয় হয়। মুনাফা ধর্মের তোয়াক্কা করে না; আবার করে, যখন ধর্মীয় জিগির তুললে আরও অধিক মুনাফা হবে বলে সে মনে করে।

চামড়া শিল্প : নতুন শিল্প নগরীর অব্যবস্থাপনা

২০১৭ সালে হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তর ঘটে চামড়া শিল্প নগরীর। প্রায় ২০০ একর জমির উপর স্থাপিত এর নির্মাণ কাজ ১৬ বছরেও শেষ হয়নি। লুটপাট-দুর্নীতির ফলে ১৭৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এখন ঠেকেছে ১ হাজার ৭৮ কোটি টাকায়। শিল্পাঞ্চল জুড়ে রাস্তায় একটু পরপর জমে আছে নোংরা-দুর্গন্ধময় পানি। কিছু রাস্তায় হাঁটা প্রায় অসম্ভব। কিছু রাস্তা ছোট গাড়ি চলাচলেরও উপযোগী নেই।

এখনও প্রস্তুত হয়নি চামড়ার কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান বা ডাম্পিং ইয়ার্ড। পুরোদমে চালু হয়নি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি)। এ কাজ দেড় বছরে হওয়ার কথা থাকলেও ৫ বছরেও শেষ হয়নি। নির্মাণ খরচ ছাড়িয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। তরল বর্জ্য শোধন করার কাজ (ডি-ওয়াটারিং) হচ্ছে না। কারণ এ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র এখনও আসেনি। এই প্রজেক্টের টাকা লুটপাট যেমন চলছে, তেমনি বছরের পর বছর ধরে শিল্পাঞ্চলকে অযোগ্য করে রেখে লাভ হচ্ছে কার? মালিকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি? তারা তো তাদের বিভিন্ন ক্ষতি দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে প্রণোদনা পেতে পারেন সহজেই, পাচ্ছেনও। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা কি সেরকম?

চামড়া শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা

হাজারীবাগের চেয়ে সাভারে কয়েকগুণ বেশি জমি দিয়ে মালিকদের প্ল্যান্ট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আছে ক্ষতিপূরণ ও ১০ শতাংশ প্রণোদনা। অথচ যে শ্রমিক হাত না লাগালে কারখানার চাকা ঘুরবে না–তাদের জন্য ন্যূনতম অধিকার এখানে নিশ্চিত করা হয়নি। আবাসন-হাসপাতাল-ক্যান্টিন কিছুই নেই। হাজারীবাগে যেসব শ্রমিক কাজ করতেন, তাদের বড় একটা অংশ ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন। অন্য যারা সাভারে যুক্ত হয়েছেন, তারা এখনও হাজারীবাগ থেকেই বাসে বা লেগুনাতে যাতায়াত করেন। কারণ, ট্যানারি চালু হওয়ার পর সাভার এলাকায় বাসা ভাড়া বেড়েছে কয়েকগুণ। এ শিল্পে যুক্ত ২০ হাজার শ্রমিক মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে। শ্রমিকরা নিরাপত্তা সামগ্রী ছাড়াই বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে।

শ্রমজীবী-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষেরাই মূলত আক্রান্ত

পোশাক শিল্পের পরই চামড়ার স্থান। ১৯৭০ সাল থেকে এ শিল্পের বিকাশ ঘটলেও বর্তমানে সুষ্ঠু জাতীয় নীতির অভাব, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার ফলে এ শিল্প আজ সংকটের মুখোমুখি। শিল্প বিস্তার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়, শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি এনজিও'র অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চামড়া চীন ছাড়া আর কেউ কিনছে না। অথচ এ ব্যাপারে কোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগ সরকরের দেখা যাচ্ছে না। কারণ চামড়া তো চীনে বিক্রি হচ্ছে, সেটা থেকে লাভ তো আসছেই। আবার এই সংকটের দোহাই দিয়ে ব্যাংক ঋণ মওকুফসহ সরকারি সকল রকম প্রণোদনা পাওয়া যাবে। সকল রকম অন্যায় করে বলা যাবে, আমরা খুব সংকটে, শিল্পটাকে বাঁচান। আর এই শ্রেণিবিভক্ত রাষ্ট্রে শিল্প বাঁচানো মানে শিল্পমালিকদের বাঁচানো; আর যারা শিল্পের প্রাণ, সেই শ্রমিকসহ কাঁচামাল আসার প্রক্রিয়ায় যত মানুষ প্রকৃতই শ্রম দেয়–তাদের আরও মানবেতর জীবনে নিক্ষেপ করা।

কতিপয় 'তুঘলকি কাণ্ড'!

'তুঘলকি কাণ্ড' বলে একটা প্রবাদ আছে। চতুর্দশ শতাব্দির দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক শাহ'র অদ্ভুত সব কাণ্ডকীর্তি, জোর-জবরদস্তির ঘটনাগুলোই ইতিহাসে 'তুঘলকি কাণ্ড' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আজ সেই সুলতানি আমলও নেই, তুঘলক শাহও নেই, কিন্তু 'তুঘলকি কাণ্ড' আছে। আসুন দেখে নিই এরকম কিছু ঘটনা।

ডেঙ্গু নিয়ে সারা দেশ যখন শঙ্কিত, তখন এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী বলছেন " ... ডেঙ্গু এলিট শ্রেণির একটি মশা। এ মশা সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, কলকাতা শহরে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশ হতে যাচ্ছে, তাই এখন ডেঙ্গু এসেছে...।"

সম্প্রতি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করলে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলছেন " ... এখন লোডশেডিং নেই, সবাই বেশ আরাম-আয়েশে আছে বলেই ভুলে গেছে অতীতের কথা ...।" তিনি ব্যঙ্গ করে আরও বলছেন "খুব ভালো, বহুদিন পর হরতাল পেলাম তো, পরিবেশের জন্য ভালো ...।"

রানা প্লাজায় ভবন ধ্বসে শত শত শ্রমিক নিহত হবার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য হলো "হরতালকারী ও মৌলবাদীরা এই ভবনের স্তম্ভ ধরে টানাটানি করায় ভবন ধসে পড়তে পারে ...।"

হলমার্ক কেলেংকারিতে চার হাজার কোটি টাকা লোপাট হবার পর অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এ তো সামান্য টাকা'।

বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে নারী লাঞ্ছনার পর পুলিশের আইজিপি বলেছিলেন "পহেলা বৈশাখের ঘটনা কয়েকটি ছেলের দুষ্টামি।"

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এরকম বক্তব্য 'তুঘলকি কাণ্ড' নয় কি?

এই ধরনের বক্তব্য থেকে আমরা কী ধারণা নিতে পারি

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ-দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, এমপি, প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়বোধের করুণ চিত্রটি বের হয়ে এসেছে। বাস্তবে এ রকম ঘটল কেন? এর উত্তর খুজতে হবে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার চরিত্রের উপর। এদেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শাসক ধনিক শ্রেণি, অন্যদিকে শ্রমজীবী মেহনতি জনতা। যতদিন যাচ্ছে, সমাজে বৈষম্য ততই প্রকট হচ্ছে। বৈষম্য শুধু সম্পদের দিক থেকে নয়; আইন, প্রশাসন, ন্যায়বিচার, সমাজিক সুরক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা বাড়ছে। গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ প্রথম আলো তাদের এক প্রতিবেদনে দেখাচ্ছে "অতিধনীর বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বে প্রথম। এখন দেখা যাচ্ছে, ধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকেও বাংলাদেশ এগিয়ে, বিশ্বে তৃতীয়।" তার পরদিন একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, 'গরীব মানুষের বসবাসে বিশ্বে পঞ্চম বাংলাদেশ'। অর্থাৎ গোটা সমাজটা স্পষ্টতই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। কথাটা এত সহজ ভাবে বুঝলে হবে না, এর মধ্যে নিহিত আছে সমাজের ভাঙনের চিত্র। বিষয়টা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, সম্পদ ক্রমেই মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, আর দীর্ঘ হচ্ছে গরীব মানুষের মিছিল। এই গরীব যারা হচ্ছেন তারা কারা? এরা হলেন এক সময়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজির মালিক বা মধ্যবিত্ত; যারা দ্রুতই তাদের অবস্থান থেকে ছিটকে যাচ্ছেন। ফলে আমাদের সমাজে, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে, প্রতিদিনের যাপিত জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। সমাজে নানা চিন্তাভাবনার আদান প্রদান, নানা মত ও পথের অবস্থান সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তাই বুর্জোয়া অর্থেও যে বহুদলীয় সংস্কৃতি ছিল, তা মার খাচ্ছে। '৯০ পরবর্তী গত ৩০ বছরে কার্যত এদেশে বড় কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম বা গণআন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ফলে তথাকথিত মন্ত্রী, এমপি বা প্রতিষ্ঠিত দলের বর্তমান নেতাদের একটি বড় অংশ ন্যূনতম রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসেননি। আবার একচেটিয়া ধনকুবেরদের স্বার্থে দেশে একটি ফ্যাসিবাদী শাসন কাঠামো দরকার। গত প্রায় ১৫ বছর ধরে মহাজোট সরকার এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে সমাজের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কায়েমী স্বার্থবাদী একটি শক্তিশালী চেইন গড়ে উঠেছে। প্রশাসন, আমলাতন্ত্রসহ একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, যা গত নির্বাচনে মূর্ত হয়েছে। এই গোটা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মুখপত্র আমাদের মন্ত্রী, এমপি, আমলারা। ফলে তাদের দায়হীন-উন্মাদ বক্তব্যগুলো, শুধু একটা কথার কথা নয়, বরং অন্যায্য সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রকাশমাত্র। আমরা চাই বা না চাই, শেষ বিচারে রাজনীতিই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। নেতৃত্বই মূলত জনগণকে, সমাজকে পরিচালনা করে। ফলে নেতৃত্বের গুণাগুণ, আচরণ দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক-নৈতিক মানকে প্রভাবিত করে। আবার জনগণের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই নেতৃত্ব বের হয়ে আসে। আজকে পুঁজিবাদ অবক্ষয়ী, মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন সে ধারণ করে না। আর এই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী নেতৃত্ব কোনোভাবেই জনগণকে একটা নৈতিক বোধে উজ্জীবিত করতে পারে না। এই কারণেই মন্ত্রী, এমপি, আমলাদের বক্তব্যে ক্ষমতার দম্ভ, অহমিকা প্রকাশ পায়। প্রকৃত অর্থে জনস্বার্থে লড়াই ছাড়া নৈতিকতা মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের স্বার্থকে ধারণ করে সর্বব্যাপক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা আজ জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র পথ।

ভারতীয় নবজাগরণ ও সেক্যুলার মানবতাবাদের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যদায় পালন করুন

গত ২৪ আগস্ট ছিল 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'। ১৯৯২ সালে কিশোরী ইয়াসমিন হত্যার পরবর্তী সময়ে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। দিনাজপুরের ৭ জন মানুষ সেদিন পুলিশের গুলিতে মারা যায়। বুকের রক্ত দিয়ে ইয়াসমিন হত্যার বিচার প্রতিষ্ঠা করে জনতা শিক্ষা দেয় যে, আন্দোলন করেই বিচার আদায় করতে হয়। বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র সারাদেশে এ দিবসটি পালন করে।

সংগঠন সংবাদ

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ঝিলপাড় বস্তিতে ত্রাণ বিতরণ, দুয়ারীপাড়ায় মেডিকেল ক্যাম্প

ঢাকার মিরপুরের ঝিলপাড় বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে অর্ধলক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঘরবাড়ি হারিয়ে আরও মানবেতর অবস্থায় পতিত হয় হাজার হাজার মানুষ। বাসদ (মার্কসবাদী) মিরপুর থানা শাখা ঘটনার পরদিন থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবির পাশাপাশি ত্রাণ সংগ্রহে নামে। গত ৫ সেপ্টেম্বর ঝিলপাড় বস্তিতে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক ও ঢাকা নগর শাখার ইনচার্জ নাঈমা খালেদ মনিকা। এর পরের দিন ৬ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানা শাখার আহ্বায়ক ডা. মুজিবুল হক আরজুর তত্ত্বাবধানে দুয়ারীপাড়ায় একটি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

জনজীবনের দশ দফা দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে

রংপুরে প্রাথমিক সদস্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত

মাসব্যাপী সদস্য সংগ্রহ করার পর প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখা।

প্রতি ইউনিট পানির দাম আবাসিক সংযোগে ৯ টাকা ৯২ পয়সার স্থলে ১৬ টাকা ও বাণিজ্যিক সংযোগে ২৭ টাকা ৫৭ পয়সার স্থলে ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে ওয়াসা। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরীর দামপাড়া ওয়াসা ভবনের সামনে বামজোটের বিক্ষোভ।

সাম্যবাদ

রোহিঙ্গা সংকট: সরকার

শরণার্থীদের সবাই একই রকম হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দুই বছর পরেও দেশে ফেরার অনিশ্চয়তা, আবার প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্বল অবস্থান, যে কারণে তারা কেউই দেশে ফিরতে চাইছেন না–এসবকিছু মিলে তাদের জীবনের পথের সামনের দু'পাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এইরকম পরিস্থিতিতে তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হলে একটা দিশা তারা পেতে পারতেন। কিন্তু অসহায় এই মানুষেরা এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট উদ্যোগ দেখতে পারছেন না। এই অনিশ্চিত জীবন তাদের বিভিন্ন অনৈতিক, বেআইনি কাজে যুক্ত করে দেবে, যেটা হয়তো স্বাভাবিক জীবনে তারা ভাবতেই পারতেন না।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা

বাংলাদেশ প্রত্যাবাসনের এই চুক্তি করেছে দ্বিপাক্ষিকভাবে। অর্থাৎ মিয়ানমার যদি চুক্তি ভাঙে, তাহলে তৃতীয় কেউ বিচার করার বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো নেই। আজ অবস্থার চাপে পড়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন করা হোক, যারা দেখবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কী। এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে ভুল আছে। কিন্তু এখন এই সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ করতে চাইলেও তা পারা খুবই কঠিন। যখন মিয়ানমারে এই গণহত্যা চলছিল, যখন দলে দলে লোক বাংলাদেশে ঢুকছিল–তখনই ছিল এর উৎকৃষ্ট সময়, কারণ তখন গোটা বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্র ছিল এই রোহিঙ্গা সমস্যা। কিন্তু এখন একটা আন্তর্জাতিক কমিশন করা একটা কঠিন ব্যাপার। কারণ আন্তর্জাতিক মনযোগ থেকে রোহিঙ্গা ইস্যু অনেকটাই সরে গেছে। সে সময় রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে 'সেফ জোন' গঠন করার প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এসকল গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছাড়াই বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ভারতের সাথে দেশের ধন-সম্পদ উজার করে দেওয়া বন্ধুত্ব থাকলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে তার সামান্যতম সহযোগিতা আদায় করতে পারেনি সরকার। ভারত মিয়ানমারের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ করে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম মিত্র চীন ও রাশিয়ার সহযোগিতাও সে পায়নি। এক কথায় কূটনৈতিক পরিসরে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সরকার।

ব্যর্থ কূটনীতির পর উস্কানিমূলক বক্তব্য–সরকারের উদ্দেশ্য কী

"রোহিঙ্গাদের ফিরে যেতেই হবে। তাদের আর বসিয়ে বসিয়ে আমরা খাওয়াতে পারব না। ... আমরা তো তাদের দাবির কাছে জিম্মি হয়ে থাকতে পারি না। তাদের দাবি নিজের দেশে গিয়েই অর্জন করতে হবে।"–এরকম বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী করছেন কোনো পরিণাম চিন্তা না করে। এই চিন্তা মানুষের মধ্যে ছড়ায়। তার অভিযোগের কোনোটারই কোনো সারবত্তা নেই। গণহত্যাকারী সামরিক জান্তার কাছে গিয়ে সে কীসের দাবি করবে? একেবারে হতদরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর কী ক্ষমতা আছে? তাদের কোনো নেতাও নেই। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও খুব কম এদের মধ্যে, কারণ মিয়ানমার সরকার শিক্ষার অধিকার তাদের দেয়নি। বাংলাদেশ সরকারই ছিল বিশ্বের দরবারে তাদের প্রতিনিধি। সরকার যদি একটা অসম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে আসেন, তার দায় কেন রোহিঙ্গারা নেবে?

এখন এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য ছড়ানো মানে পরিস্থিতি জটিল করে তোলা। সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতাসহ সার্বিক ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, সরকার নিজেও চাইছে না রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ফিরে যাক। কিছু লোক দেখানো পদক্ষেপ ছাড়া সরকার এই ইস্যু নিয়ে দেশে দেশে ঘুরছে–এমনটা আমরা দেখছি কি? যে সকল রাষ্ট্র এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষে ছিল তাদের নিয়ে সরকার বিশ্বের দেশে দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে কি? আমাদের চোখে এর কিছুই পড়েনি। ফলে সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুকে নিয়ে তার নিজস্ব এজেন্ডা হাসিলের বাইরে সঠিক সমাধানের কথা ভাবছে না–এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

বস্তিবাসীদের কি এ শহরে ঠাঁই

আশায়, কেউ খাট-টিভি-ফ্রিজ কিনেছিল ধার করে অথবা কিস্তিতে। কিস্তির টাকাও এখনও শোধ হয়নি–এরই মধ্যে সর্বনাশা আগুন সব ছারখার করে দিয়ে গেল। একেবারে পথে নামিয়ে দিয়ে গেল। সর্বশেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়ে তারা আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

অবশ্য নিশ্চয়তা বস্তিবাসীদের জীবনে কখনওই থাকে না। শুধু ঝিলপাড় বস্তি কেন, ঢাকা শহরে প্রায় হাজার পাঁচেক বস্তিতে যে প্রায় ৪০ লাখেরও অধিক মানুষ বসবাস করে, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তা তাদের জীবনের সঙ্গী। এই বস্তিগুলো যেসব এলাকায় গড়ে উঠেছে, তা চাকচিক্যময় অভিজাত এলাকা ধানমণ্ডি, গুলশানের মতো এলাকাগুলোর পাশেই। এসব জায়গায় গড়ে ওঠা বস্তিগুলো সবসময়ই ক্ষমতাসীনরা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বস্তিবাসীরা হয়েছে ক্ষমতাসীনদের ঘুঁটি। ভাড়া আর চাঁদার টাকায় গড়ে তুলেছে অঢেল অর্থের পাহাড়। ফলে মানুষের জীবনের চেয়েও এদের কাছে টাকার মূল্যই বেশি। তাই কখনও বস্তি গড়ে টাকা তুলেছে। আবার জমির মূল্য বাড়ায় জমি দখলের জন্য উচ্ছেদ করেছে। বস্তিবাসীদের প্রতিরোধের মুখে সরাসরি উচ্ছেদ করতে পারে না। তাই রাতের অন্ধকারে আগুনে পুড়িয়ে সর্বস্বান্ত করে তাড়ায়। এর আগেও কড়াইল বস্তিতে এরকম একাধিক বার আগুন লেগেছে। আগুন লেগেছে মিরপুরের মোল্লা বস্তিতে, কল্যাণপুর বস্তিতে। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনেই দখলদারদের ইন্ধন ছিল। ঝিলপাড় বস্তিতেও আগুনের ঘটনার পেছনে এই ভূমিদস্যুদের হাত আছে বলে ইতোমধ্যেই বস্তিবাসীরা অভিযোগ করেছে। যারা ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা। তাই সবসময়ই এরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

প্রতিবারই বস্তি পুড়লে সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীরা পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু দিন শেষে কেউই আর খোঁজ রাখে না। সরকারের উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও এসব হতভাগ্যের কপালে জুটে না। উন্নয়ন (!) হয় বস্তি উজাড় করে, আর অট্টালিকার সংখ্যা বাড়ে শহরে। যেখানে বস্তির মানুষের ঠাঁই নেই।

আমাজন থেকে সুন্দরবন

গত বছরের এ সময়ের তুলনায় এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। সরকারের এ নীতির ফলে উৎসাহিত হয়ে বড় ব্যবসায়ীরা যেন আমাজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আরও প্রবল গতিতে চলছে বন উজাড়, আদিবাসীদের জমি দখল, উচ্ছেদ, ভয়ভীতি প্রদর্শন–এমনকী হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত। আমাজন সংলগ্ন জঙ্গল শহর মানাউসে ফ্রি ট্রেড জোন, প্যারা প্রদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লোহার খনি, আমাজনের দক্ষিণ অংশে গবাদি পশু ও সয়াবিনের বিরাট বিরাট খামার গড়ে উঠেছে। টাপাজোস নদীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যার তীরে মুন্ডুরকু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। হীরে ও সোনার খনির মালিকরা তাদের পানি দূষিত করছে, জমি দখল করছে, বনভূমি উজাড় করছে কিন্তু রাষ্ট্র নির্বিকার।

বাংলাদেশের প্রাণ-প্রকৃতি, বাংলাদেশের উন্নয়ন

ব্রাজিলের মতোই বাংলাদেশে চলছে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের নামে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের প্রবল উম্মাদনা। এ উন্মাদনায় বিপর্যস্ত প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। বিশেষজ্ঞ ও দেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে চলছে সুন্দরবনের পাশেই রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ। দেশ-বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত-যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা পরিবহন ও কয়লা পোড়ানোতে যে পানি, বায়ু ও মাটিদূষণ হবে, তাতে সুন্দরবনের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে বিপন্ন হবে। কিন্তু সরকার কোনো কর্ণপাত করছে না। এতে উৎসাহী হয়ে সুন্দরবনে শিল্পকারখানা স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। সুন্দরবনের ১০ কি.মি. এলাকার মধ্যে ৩২০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সবক'টিই দূষণকারী, এর মধ্যে ২৪টি মারাত্মক দূষণকারী শিল্প। সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চারদিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা, যা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে চিহ্নিত, তার মধ্যেই সুন্দরবন থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে, পরিবেশ দূষণকারী বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা এবং চার কিলোমিটারের মধ্যে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বসুন্ধরা, ওরিয়ন, নাভানাসহ কয়েকটি কোম্পানিকে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে সরকার। এগুলো সবই সুন্দরবনের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। কারখানা আছে এমন এলাকায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা, কারখানা নেই এমন এলাকার চেয়ে দুই তৃতীয়াংশ কম।

সুন্দরবনই শুধু নয়, কক্সবাজারের মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও সোনাদিয়ায় উন্নয়নের নামে চলছে পাহাড় কাটা, গাছ কাটা, প্রকৃতি ধ্বংসের মহাযজ্ঞ। মহেশখালী একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপবন, যেখানে মিঠা-লোনা দুই রকম পানির জগতই আছে। এই উপকূলীয় এলাকা প্রাণবৈচিত্র্যের অনন্য আধার। সেই মহেশখালীতে ২৬টি বড় প্রকল্প হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (ইসিআর) অনুযায়ী এগুলোর ২২টি লাল অর্থাৎ মারাত্মক পরিবেশদূষণকারী প্রকল্প। বাকি চারটি কমলা অর্থাৎ মাঝারি মাত্রায় দূষণের শ্রেণিভুক্ত। সবক'টি প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে ধরা হয়েছে প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা। অন্যান্য দ্বীপ মিলিয়ে এ অঞ্চলে বিনিয়োগ আরও অনেক বেশি হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, পাহাড় ও বন কাটা পড়ছে, নদীতে ফেলা হচ্ছে বর্জ্য। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাগদা, ভেটকি ও কাঁকড়ার চাষ।

সরকার ১ হাজার ১ টাকা সেলামিতে সোনাদিয়া দ্বীপটিকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে (বেজা) দীর্ঘ মেয়াদে বরাদ্দ দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে দ্বীপের ৩০ শতাংশ এলাকায় পরিবেশবান্ধব ইকোট্যুরিজম পার্ক হবে। ভারতীয় কোম্পানি মাহিন্দ্র গ্রুপকে যুক্ত করে ৫০০ একরের মতো এলাকার নকশা চূড়ান্ত হয়েছে। বেজা হোটেল-মোটেল ও গলফ কোর্টের জন্য ৫০০ একর এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫৫১ একর জমি রেখেছে। প্রকল্পের আওতায় ১০টি হোটেল ও মোটেল, দুটি গলফ কোর্ট ও দুটি টেনিস কোর্ট হবে। থাকবে শিশু পার্ক, মসজিদ, জাদুঘর, কমিউনিটি সেন্টার, শৈবাল চাষ, মুক্তা চাষসহ নানা তৎপরতা। ৩০ একর জমিতে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে। সোনাদিয়ার ৪৭ শতাংশ এলাকায় এখনও বাদাবন তথা শ্বাসমূলীয় বন রয়েছে। গত দুই যুগে বনের ২৬ শতাংশ ধ্বংস করা হয়েছে। সমীক্ষা বলছে, দ্বীপটি দেশের প্রধান জীববৈচিত্র্যপূর্ণ জলাভূমি এলাকাগুলোর একটি। জাতিসংঘ একে 'রামসার এলাকা' ঘোষণা করে বৈশ্বিক পরিসরে একই স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ সেই সোনাদিয়া এখন মরতে বসেছে।

শুধু পরিবেশের ক্ষতি নয়, উচ্ছেদ হয় মানুষ

প্রতিটি প্রকল্পে উচ্ছেদ হচ্ছে এলাকার শ্রমজীবী মানুষ, যারা সেই প্রকৃতিরই আলো-ছায়ায় বড়। প্রকৃতির কর্ষণ করে তার বুকে সে ফসল ফলায়। কিন্তু উন্নয়নের ধাক্কায় পরিবেশের সাথে মানুষও যায়, বেশিরভাগ সময়ই তা সামনে আসে না। 'আর্টিকুলেশন অফ ইনডিজিনিয়াস পিপলস অফ ব্রাজিলে'র নেতা গ্যায়াজাজারার সংবামাধ্যমকে দেওয়া বক্তব্যে আমাজনের আদিবাসীদের আশঙ্কা উঠে এসেছে–"আদিবাসীরা পুঁজিবাদের বিপক্ষে। মুষ্টিমেয় মানুষের মুনাফা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য ধ্বংস ও মৃত্যু ডেকে আনছে। আমাজনে যদি কৃষিবাণিজ্যের (ধমৎড়নঁংরহবংং) এ ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে শুধু আমাজন ধ্বংস হয়ে যাবে তাই নয়, পুরো পৃথিবীতে বন বলে আর কিছু থাকবে না।"

দৈনিক প্রথম আলো মহেশখালীর সুভাষ নাথের বক্তব্য ছাপিয়েছে। ক্ষিপ্ত এই প্রৌড়ের বক্তব্য, "আমরা এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা, জাতে নাথ সম্প্রদায়ের। আমাদের দ্বীপে আমরা থাকতে পারছি না। বড় বড় রাস্তা হচ্ছে, পাহাড় কেটে সমান করা হচ্ছে। বন কেটে সাবাড় করা হচ্ছে। আমাদের বাড়িঘর সব চলে যাচ্ছে।"

এভাবে একের পর এক কৃষিজমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করে সেখানে ইপিজেড গড়ে তোলা হচ্ছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে গড়ে উঠছে ট্যুরিজমের নামে হোটেল-রিসোর্ট ব্যবসা, বাণিজ্যিক রাবার, সেগুন বাগান।

এই যাত্রার ভবিষ্যৎ কী

শিল্পোন্নত দেশগুলোর নির্গত গ্রিন হাউজ গ্যাস বিশ্বের উষ্ণতা বাড়াচ্ছে। মাত্র ১০০ কোম্পানি পৃথিবীর ৭০ ভাগ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী। এমন অবস্থা চললে আগামী ৫০ বছরে বিশ্বের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুসহ হিমালয় ইত্যাদির বরফ গলায় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে। এই বৃদ্ধি প্রতিহত করতে না পারলে উপকূলবর্তী এলাকাগুলো দ্রুত তলিয়ে যাবে। কয়েক হাজার দ্বীপ বিলুপ্ত হবে। একদিকে বরফ গলছে অন্য দিকে আফ্রিকা, ব্রাজিল, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া, চীন ইত্যাদি এলাকার ব্যাপক বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত কমছে। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্পের হার বাড়ছে। কিন্তু মুনাফার ঠুলিতে পুঁজিবাদের চোখ বাঁধা। জগৎ-সংসার সব তলিয়ে যাক, কিন্তু পুঁজির চাই শুধু মুনাফা। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে মহামতি কার্ল মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে টি.জে. ডানিং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, "মুনাফার সম্ভাবনা দেখলেই পুঁজি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০% নিশ্চিত মুনাফা হবে জানলে যেখানেই বলবে পুঁজি সেখানেই খাটতে যাবে, ২০ শতাংশ লাভের নিশ্চিত আশ্বাসে তার চোখ চকচক করবে, ৫০ শতাংশ লাভের লোভে তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াবে, ১০০ ভাগ লাভ হবে জানলে সে ন্যূনতম মানবতাটুকুর গলায় পা দিয়ে দাঁড়াবে। ৩০০ ভাগ লাভ হবে এই নিশ্চয়তা পেলে হেন অপকর্ম নেই যা সে করবে না, এমন ঝুঁকি নেই যা সে নেবে না, এমনকী পুঁজির মালিকের ফাঁসি হতে পারে জেনেও পুঁজি ছুটবে লাভের অদম্য লালসায়।"

তাই আজ প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রের লড়াই জোরদার করতে হবে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

ভবিষ্যতেও এই ধরনের আক্রমণের স্বীকার আমরা হব না–এর কোনো গ্যারান্টি আছে কি?"

শেখ আব্দুল্লাহর সেই বিচার ও বিশ্লেষণ যে সর্বকালে, সর্বপরিস্থিতিতে এক হবে তা নয়। এই সময়ের বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা একে অন্যভাবেও ভাবতে পারি। কারণ আমেরিকার কোলের কাছে আমরা ছোট্ট দেশ কিউবাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখেছি। উত্তর কোরিয়া কিংবা ভিয়েতনামও ছোট দেশ, অথচ কোনো বাধাই তাদের আটকাতে পারেনি। কিন্তু কাশ্মীরের পরিস্থিতি কী বলছে? বর্তমানে কাশ্মীরের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্বগুলো বিশ্লেষণ করলে শেখ আব্দুল্লাহর এ সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে কি? লাদাখ, বালতিস্তান আর কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের উপজাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা (হধঃরড়হধষরঃ ধংঢ়রৎধঃরড়হ) কি এক? কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও আঞ্চলিক স্বশাসনের দাবি আছে। তিনটি মুখ্য ধর্ম অনুসরণকারী এথনিক ও ভাষাগত ৫/৬ টি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে কাশ্মীর গঠিত। এই আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর সবাইকে যুক্ত করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা এখানে গড়ে ওঠেনি। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কোনো অবিসংবাদিত নেতারও আবির্ভাব সেখানে ঘটেনি। শেখ আব্দুল্লাহর পরে বিভিন্ন অংশে গোটা রাজনীতি বারবার বিভক্তই হয়েছে। এই ফ্যাক্টরগুলো কি স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করে?

আবার কাশ্মীরের পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও অনেকে মত দিচ্ছেন। এর যুক্তি হিসেবে দেখানো হচ্ছে যে, পাকিস্তান অধ্যুষিত কাশ্মীর তো তুলনামূলকভাবে ভালো আছে। এই অত্যাচার তো সেখানে নেই। কথাটা আপেক্ষিক অর্থে ঠিক, কিন্তু এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটাও ভেবে দেখা দরকার, যে জাতিগত মর্যাদাবোধ রক্ষার জন্য কাশ্মীরীদের এত অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, পাকিস্তান তার মূল্য দেবে তো? পাকিস্তানের ইতিহাস কী বলে? একই ধর্মের শাসকগোষ্ঠী হলেই তাতে উপজাতিগত ও আঞ্চলিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় না। পাকিস্তানে অন্য উপজাতিদের উপর পাঞ্জাবীদের আধিপত্য, বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা কাশ্মীরীদের আত্মমর্যাদা বজায় রেখে চলতে পারার নিশ্চয়তা দেয় না।

আজ কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সঠিক পথে ন্যাশনালিটি সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ তৈরি করেছিল। এখন এই একচেটিয়া পুঁজির যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মানেই বিভিন্ন উপজাতির উপর বৃহৎ উপজাতির দমন-পীড়ন চলবে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলবে। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ঐক্যই সম্ভব নয়। তা না হলে আমাদের দেশ স্বাধীন হতো না, ভারতের ভেতরে হিন্দু অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চিন্তা জন্ম নিত না। কিন্তু এ-ও ঠিক, এই প্রবল অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরীরা আর চলতে পারে না। ভারত সরকার যদি মনে করে, এভাবে সে এই রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে, তাহলে ভুল করছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এভাবে কোনো জনগোষ্ঠীকে দমিয়ে রাখা যায় না। সেক্ষেত্রে তার ভবিষ্যৎ কী হবে এবং কখন সেটা গুণগত পরিবর্তনে রূপ নেবে–সেটা জানার জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণ ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলো যদি দেশের অভ্যন্তরে একটা প্রবল আন্দোলন তৈরি করতে পারে, ৩৭০ ধারার যথাযথ প্রয়োগে সরকারকে বাধ্য করতে পারে, তবে হয়তো মানুষকে আশ্বস্ত করা যাবে, মূল ভূখণ্ডের লড়াই করা লোকেদের সাথে তাদের একটা ঐক্য তৈরি হবে। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, কাশ্মীরীদের মধ্যে যদি স্বাধীনতা কিংবা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি–এর কোনো একটা দাবি স্থায়ী হয়, সেটা নিয়ে আন্দোলন হয়, তবে প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল কোন শক্তির হাতে তার নেতৃত্ব থাকছে তার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। আরেকটা গতিপথ আছে, সেটা হলো বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সরাসরি হস্তক্ষেপ–সেটা হলে শুধু কাশ্মীর নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলেই এর একটা দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক ফল বর্তাবে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

আবার রাজ্যগুলোর দিক থেকেও অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করার একটা প্রয়োজন ছিল। কারণ রেল, সড়ক ও জলপথের যোগাযোগ; ডাক ও তার; খাদ্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা ব্রিটিশ ভারতের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। ফলে সহজেই আলাদা হয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, বরং যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এই রাষ্ট্র দুটির কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্তিই ছিল তুলনামূলকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত। এই অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম ও তাদের অবস্থানগত সংলগ্নতা–এ দুটি বিষয়ই মূলত মানদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে।

কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি

জম্মু ও কাশ্মীর একটি মুসলিমপ্রধান রাজ্য, যার শাসনভার ছিল হিন্দু রাজা হরি সিংয়ের হাতে। মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান অনুযায়ী এ রাজ্যের পাকিস্তানের সাথেই সংযুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান কিংবা হরি সিংয়ের ইচ্ছা নয়, কাশ্মীরের সংযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো আরেকটি ফ্যাক্টর। কাশ্মীরের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তখন শেখ আব্দুল্লাহ্ উঠে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' কাশ্মীর উপত্যকার জনগণকে নিয়ে সামন্তী রাজা হরি সিং ও তার চূড়ান্ত অত্যাচারী ডোগরা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করে এক কাশ্মিরী আত্মপরিচয়ের জন্ম দিয়েছিল। কাশ্মিরী জনগণের এই স্বতন্ত্র জাতিসত্তাবোধ অন্তর্ভুক্তির মূল মানদণ্ড ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সমর্থন করেনি। যখন ধর্মভিত্তিক দেশভাগ নিয়ে গোটা উপমহাদেশ দাঙ্গা কবলিত ও হিন্দু-মুসলমান এই সম্প্রদায়ের মানুষের একাংশ হত্যার তাণ্ডবলীলায় উন্মত্ত, কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর নেতৃত্বে দাঙ্গার পথে পা বাড়ায়নি, পাকিস্তানের সাথেও অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। এই মূল্যবোধ সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে দৃষ্টান্তমূলক। এরকম একটি পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে দখল করতে পাকিস্তান সামরিক অভিযান চালায় ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবরে। তারা প্রথমেই বাধা পায় শেখ আব্দুল্লাহ্র ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্যোগে সংগঠিত 'গণবাহিনী'র (চবড়ঢ়ষহ্বং সরষরঃরধ) কাছ থেকে। পাকিস্তানের এ আক্রমণকে কাশ্মীরের জনগণ তাদের স্বাতন্ত্র্য ও আজাদীর উপর আঘাত হিসেবেই নিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরের জনগণ, তাদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ আব্দুল্লাহ্র ন্যাশনাল কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতে অন্তর্ভুক্তিকে অনুমোদন দেয়। রাজা হরি সিং ভারতে অন্তর্ভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ শেখ আব্দুল্লাহ্ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হন।

শুধু পাকিস্তানের আক্রমণের কারণেই যে এমনটা ঘটে গেল ব্যাপারটা তা নয়। কাশ্মীরের জনগণের আকাঙ্ক্ষা তখন পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার অনুকূলে ছিল না। শেখ আব্দুল্লাহ্র নেতৃত্বে দীর্ঘদিন সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়ে সেখানে একটা ধর্মনিরপেক্ষ মনন গড়ে উঠেছিল। এই প্রেক্ষিতেই ১৯৩২ সালে গঠিত 'কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স' সকল ধর্মের কাশ্মীরীদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ১৯৩৯ সালে তার নাম পাল্টে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' রাখে। আবার রাজার নিরঙ্কুশ শাসনের অবসানের জন্য লড়াই যেহেতু তারা করেছে, তাই একটি গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও তাদের মধ্যে ছিল। এ দুটোর কোনোটাই পাকিস্তানের চিন্তার সাথে খাপ খায় না। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোটা ধর্মভিত্তিক ও সামন্ত বৈশিষ্ট্যের। অপরদিকে ভারত তখন তার সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা নিয়ে এসেছে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। ফলে স্বভাবতই শেখ আব্দুল্লাহ্ ও কাশ্মীরের জনগণ অন্তর্ভুক্তির তুলনামূলক বিচারে ভারতকেই বিবেচনা করেছেন। গণপরিষদে পেশ করা শেখ আব্দুল্লাহ্র বক্তব্য থেকে আমরা পাই, "একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র তার সংবিধানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংবিধান গোটা দেশের সামনে সেক্যুলার গণতন্ত্রের লক্ষ্য তুলে ধরেছে–কোনরকম ভেদাভেদ না করে সকলের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারই যার ভিত্তি। এটাই আধুনিক গণতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তি। এটাই আধুনিক গণতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিভূমি। এটার দ্বারা তাঁদের সেই প্রশ্নের জবাব হয়ে যায় যাঁরা বলেন যে, ভারতের জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু হিন্দু, তাই কাশ্মীরের মুসলসমানরা সেখানে নিরাপত্তা পেতে পারে না। ... আমাদের কাশ্মীর রাজ্যের আন্দোলনেও সেক্যুলার গণতন্ত্রের এই নীতিগুলোর দিকে স্বভাবতই পাল্লা ভারী থেকেছে। এখানকার জনসাধারণ এমন কোনো নীতি কখনই মেনে নেবে না, যা অন্যান্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় বা সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখতে চায়।"

আরেকটা বিষয় শেখ আব্দুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন তাঁর বিখ্যাত বই 'আতিশ-ই-চিনার'-এ। তিনি পাকিস্তানের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের সম্ভাবনা বেশি দেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, " ... 'চাষীদের হাতে জমি'–এই নীতিকে আমরা আইনসম্মত করতে পেরেছি এবং তাকে বাস্তবেও সফল রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। ... যে পাকিস্তানে জমিদাররা দাপটের সাথে অবস্থান করছে, যেখানে অসংখ্য সামন্তী সুবিধা ও অধিকার অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে, সেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা নিজেদের যুক্ত করলে আমাদের এই সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীগুলোকে তারা মেনে নেবে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত কি?"

শেখ আবদুল্লাহ আশা করেছিলেন ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সাথে জম্মু ও কাশ্মীর যুক্ত হলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এখানে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না, বরং এই সংযুক্তি জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জীবনের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটাতে সহযোগিতা করবে। আজ ২০১৯ সালে এসে কী নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি হতে হলো আমাদের! কী বিরাট আশা ও স্বপ্ন নিয়ে কাশ্মীরের জনগণ ভারতের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, কী নিষ্ঠুর প্রতিদান তারা পেলেন! কত গভীর ও তীব্র এই আঘাত তা বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো আজ যখন শেখ আব্দুল্লাহকে ভারতের বশংবদ বলে আখ্যা দেয়, তখন কাশ্মীরীদের মধ্যেও এটা বিশ্বাস করার মতো একদল লোক পাওয়া যায়।

একের পর এক পদক্ষেপে ৩৭০ ধারাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে

শেখ আব্দুল্লাহ্ ও কাশ্মীরের জনগণের বিশ্বাসের মূল্য ভারত সরকার দেয়নি। ৩৭০ ধারায় সাংবিধানিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। তাদের স্বতন্ত্র পতাকা, এমনকী তাদের রাজ্যপ্রধান ও সরকারপ্রধানেরা 'সদর-ই-রিয়াসত' এবং 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শেখ আব্দুল্লাহ্ কখনওই কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোনোকিছুই কখনও মেনে নেননি। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির পর থেকে ভারত সরকার কাশ্মীরের জন্য অপমানজনক–এমন সিদ্ধান্ত একের পর এক নিতে থাকে। ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে শেখ আব্দুল্লাহ্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। 'ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর মধ্যেও ভারত সরকার তাদের অনুগত একদল লোক তৈরি করে। গোপালকৃষ্ণ আয়েঙ্গার যখন কেন্দ্রীয় সরকারের 'পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের' মন্ত্রী হন, দ্বন্দ্ব তখন আরও তীব্র হয়। নেহেরু আয়েঙ্গারের পাশে দাঁড়ান। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে ধাপে ধাপে বিলোপ করে অন্য রাজ্যগুলোর সাথে এক কাতারে তাকে নিয়ে আসার যে পরিকল্পনা আগে থেকেই চলছিল তা আরও গতি পায়। শেখ আব্দুল্লাহ্র সাথে ভারত সরকারের দ্বন্দ্ব অনিরসনীয় পর্যায়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ ও গ্রেফতার করা হয়।

শেখ আব্দুল্লাহ্র গ্রেফতারের পর থেকে ভারত সরকার আইনসভার ক্ষমতাবণ্টন এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা সংক্রান্ত ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক (জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নির্দেশিকা বারবার পরিবর্তন করেছে, ভারতীয় সংসদের অধিকারকে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছে। এরপর থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপে তাদের বিশেষ মর্যাদাকে প্রায় বিলুপ্ত করে এনেছে। ৩৭০ ধারা দীর্ঘদিন ধরেই অকার্যকর হয়ে আছে। তারপরও সংবিধানে থাকার কারণে যতটুকু বা এটা নিয়ে কথা বলা যেত, সে রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হলো। বলা যেতে পারে কাশ্মীর প্রসঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস যে অনৈতিক ভূমিকা নিয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় বিজেপির এই সিদ্ধান্ত।

ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ৩৭০ ধারাকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করতে পারে না

ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। অনুমোদিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালের 'গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট', ১৯৪৬ সালের 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট', ১৯৪৭ সালের 'দি ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশন অর্ডার'-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর মাধ্যমে এবং অন্তর্ভুক্তির দলিলের মাধ্যমে। ৩৭০ ধারা যেহেতু ভারতীয় সরকার কিংবা পার্লামেন্টের অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজিত হয়নি, সেহেতু সেটা বাতিলের ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট কিংবা সরকার রাখে না। এটা পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার আছে একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের পার্লামেন্টের। সে যদি তার বিশেষ মর্যাদাকে পরিত্যাগ করে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সাথে একীভূত হয়ে অন্যান্য রাজ্যের মতো তারই একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে চায়–তবেই ৩৭০ ধারা বাতিল হতে পারে, তার আগে নয়। অথচ আমরা দেখলাম, গত ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কোনো আলোচনা ছাড়াই এই ধারাকে বাতিল ঘোষণা করা হলো।

১৯৭৫-এর চুক্তি ও '৮০-এর দশক

শেখ আব্দুল্লাহ্ ১৯৬৪ সালে মুক্তি পান। এরপরেও তাকে বারবার জেলে নেওয়া হয়েছে। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে প্রায় ২০ বছরের মতো কারাগারে ছিলেন। এসময়ে ভারত সরকারের অনুগত একের পর এক পুতুল সরকার কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় বসানো হলো। এভাবে চলতে থাকলো কাশ্মীরের সাথে ভারত সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার পর্ব। এরই মাঝে, ১৯৭৭ সালে শেখ আব্দুল্লাহ্ পুনরায় কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে শেখ আব্দুল্লাহ্ একটি অসম চুক্তি করলেন। ইন্দিরা গান্ধীর আশ্বাসে বিশ্বাস করা তাঁর উচিত ছিল না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করলেন এবং সেটা তাঁর উপর জনগণের বিশ্বাসকে অনেকখানি মলিন করে দিল। ১৯৮২ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত শেখ আব্দুল্লাহ্ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

এই দীর্ঘ সময়ে কাশ্মীরে শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্থাপন করে, চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে শেখ আব্দুল্লাহ্র ছেলে ফারুক আব্দুল্লাহ্ ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্ব দেন ও নির্বাচনে জয়ী হন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই মন্ত্রীসভাকে রদ করে ও সরাসরি কেন্দ্রের শাসন জারি করে। রাজ্যপাল করা হয় জগমোহনকে। কাশ্মীরীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হয়। কাশ্মীরে একটা কথা প্রচলিত আছে, 'ঐধষভ রিফড়ি' অর্থাৎ হাজার হাজার মেয়ে তারা জানে না তাদের স্বামী বেঁচে আছেন কি না। তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের মৃত্যুও নিশ্চিত করা যায়নি। কতটা ভয়াবহ এ নির্যাতন তা বোঝার জন্য এর চেয়ে বেশি বলার দরকার পড়ে না।

এ অবস্থায় একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যায় কাশ্মীরে। এই ক্ষোভ ও অপমানকে সঠিক সংগ্রামের পথ দেখাতে যখন নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়, শেখ আব্দুল্লাহ্র পরে তার পরবর্তী নেতারা যখন কমবেশি ভারত সরকারে খেলার পুতুলে পরিণত হন, রাজনৈতিক সেই শূন্যতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে, কাশ্মীর সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে পা বাড়ায়। গণতান্ত্রিকভাবে মতপ্রকাশের সকল অধিকার সংকুচিত হলে সশস্ত্র আনেন্দালনে মানুষ যাবেই, এটাই আন্দোলনের ঐতিহাসিক শিক্ষা। সীমান্তের অপর পাশে পাকিস্তানের মৌলবাদী শক্তিও এর সুযোগ নেয়। অথচ কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ইতিহাস খুবই বিরল। কাশ্মীরীরা খুবই শান্তিপ্রিয় ও অতিথিপরায়ণ। আজ তাদের জাত্যাভিমান ও মর্যাদাবোধের উপর ক্রমাগত আক্রমণ তাদের এক অংশকে এই জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। আবার এই উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাশ্মীরের সকল নাগরিকই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

কাশ্মীরের সকল ধর্ম ও মত নির্বিশেষে সকলেই ভারত সরকারের এ ধরনের আচরণের তীব্র বিরোধী। শুধু মুসলমানরাই কাশ্মীরে সমস্যা তৈরি করছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেটা মোটেও সত্য নয়। ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রতিবাদ করে জম্মু ও কাশ্মীরের ৬৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক সম্প্রতি একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, নাট্যকর্মী, সাংবাদিক, প্রাক্তন ভাইস এয়ার মার্শাল, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা; যাঁদের অধিকাংশই কাশ্মীরী পণ্ডিত, ডোগরা ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। সরকারের এই পদক্ষেপকে তাঁরা 'অসাংবিধানিক এবং জম্মু-কাশ্মীরের মানুষকে দেওয়া ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন' বলে মন্তব্য করেছেন। পিটিশনে তাঁরা বলেছেন, যেভাবে গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে রাজ্যের বিধানসভার মতামতের তোয়াক্কা না করে গোপনীয়তার আড়ালে বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে জম্মু কাশ্মীরকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভেঙে দেওয়া হলো, তা কেন্দ্রীয় সরকারের চরম কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার প্রকাশ।

পিটিশনে তাঁরা বলেন, ''আমরা, জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, আমাদের অনুমতি ছাড়াই আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তকে আইনসঙ্গত বলা যায় না। এই একতরফা, অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত যা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, আমরা তার নিন্দা করছি ও তা প্রত্যাখ্যান করছি।''

অবিলম্বে জম্মু-কাশ্মীরের উপর অবরোধ জারির পরিস্থিতি হটিয়ে রাজ্যের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ অবাধ করতে হবে এবং সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মুক্তি দিতে হবে বলে পিটিশনে দাবি তোলেন তাঁরা।

সবশেষে তাঁরা বলেন, ''জন্মভূমির এই বিভাজনে যন্ত্রণাবিদ্ধ আমরা এই সংকটের সময়ে একজোট হয়ে দাঁড়ানোর শপথ নিচ্ছি। জাতপাত, সংস্কৃতি এবং সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে বিভাজন ঘটানোর যে কোনো অপচেষ্টা আমরা প্রতিরোধ করব।'' (সূত্র : টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১ আগস্ট, ২০১৯)

ন্যাশনালিটি প্রশ্নে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণির ভূমিকা

ভারত বহু জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাষ্ট্র। তার ন্যাশনালিটি সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিতই থেকে গেছে। যে সংহতি এখানে গড়ে উঠেছে তা শুধুই রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে একটা জাতীয়তাবোধ বিকশিত হলেও জাতপাত, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা–এসবের বিরুদ্ধে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব লড়েনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নেতৃত্বে থাকা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি ছিল শ্রমিকবিপ্লবের ভয়ে ভীত, ফলে সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে না গিয়ে আপোসের পথে হেঁটেছে। জাতপাত, কুসংস্কার, আঞ্চলিকতা–এগুলো সমাজমননে, এমনকী বুর্জোয়া আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যেও ছিল। তার প্রভাব ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আবার ভারতে একটি একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি গড়ে উঠেছে। তারা গোটা দেশে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংহত করতে চায়। সেজন্য একটি অখণ্ড ও সমসত্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের খুবই দরকার। বহুরকম জাতিসত্তা অধ্যুষিত দেশে প্রত্যেকটি জাতিসত্তার ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতির অবাধ সুযোগ করে দিয়ে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ তৈরি করে সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হয়। বড় বড় জাতিসত্তার দ্বারা ছোট জাতিসত্তার দমনের মাধ্যমে বড় জাতিসত্তার যে আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে. সেটাকে কোনোভাবেই সমর্থন না করে সকল জাতিসত্তার অবাধ ও মুক্ত বিকাশের পথ সুগম রাখতে হয়। বর্তমানের কোনো পুঁজিবাদী দেশেই আজ আর এটা সম্ভব নয়। উপরন্তু ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি বর্তমানে গভীর সংকটে নিমজ্জিত। প্রবৃদ্ধির হার কয়েক বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন, মারুতিসহ বড় বড় কোম্পানিগুলো লোক ছাঁটাই করছে, উৎপাদন বন্ধ রাখছে। গোটা দেশের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংহত করা এখন তাদের জন্য খুব দরকার। স্থানীয় পুঁজির যে বিরাট ভূমিকা এখনও ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে আছে, সেটাকে পরাস্ত করে জাতীয় পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। 'এক নেতা, এক পতাকা, এক ভাষা ও এক দেশ'–বিজেপি'র এই স্লোগানের মধ্য দিয়েই ভারতীয় পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। সহজেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তো সে যাবেই না, আজকের যুগে কোনো পুঁজিপতি দেশেরই যাওয়ার উপায় নেই। ফলে জুলুম, জবরদস্তি ও দমনের মাধ্যমেই সেটা সে করবে। কিন্তু যে বিষয়টা ভাবার মতো সেটা হলো, বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় (ভবফবৎধষ) যে কাঠামোটা থাকে, ভারত রাষ্ট্রের প্রবণতাটা সেইদিকেও আর থাকছে না। এই গতিমুখটা এখন মূলত এককেন্দ্রিক (হরঃধহু) ব্যবস্থার দিকে বেশি। সেটা ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণির এখনকার নীতি নয়, অনেক আগে থেকেই সেটা ছিল। সেকারণে দেখা যায়, যখন দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ছাড়া কোনো বিষয় তাদের ছাড়তে হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ধাপে ধাপে লাগোয়া প্রদেশগুলোর সাথে মিলিয়ে দিয়ে, না হয় একাধিক দেশীয় রাজ্যকে সংযুক্ত করে প্রদেশ ঘোষণা করে তাদেরকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। সেই দীর্ঘদিনের নীতি এখনও বলবৎ আছে, সংকট তীব্র হচ্ছে বলে আগ্রাসী মনোভাবও বাড়ছে। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণিও রাষ্ট্র ক্ষমতায় এমন শক্তিকে পছন্দ করছে, যারা এই দমন-পীড়ন ও লাগামছাড়া পদক্ষেপকে নিষ্ঠুরভাবে প্রয়োগ করতে পারে, এর বিরুদ্ধে আসা সকল বাধাকে নির্মমভাবে মোকাবেলা করতে পারে। বিজেপির উত্থানের পেছনের এটাও একটা কারণ।

কাশ্মীরীরা এখন কী চায়

বেশ কিছু সময় ধরে কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবি জোরালো হচ্ছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন চিন্তাশীল অংশেরও এমন মতামত যে, কাশ্মীর স্বাধীন হলেই ভালো। ব্যাপারটাকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখি। স্বাধীনতা নিয়ে 'জম্মু ও কাশ্মীর' গণপরিষদে অলোচনা হয়েছে। সেখানে শেখ আব্দুল্লাহ্র বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–"তৃতীয় যে পথটি আমাদের সামনে খোলা রয়েছে, তা নিয়েও আমাদের আলোচনা করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দুই রাষ্ট্র থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, কিন্তু তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, আমরা নিজেদের পূর্ব সুইজারল্যান্ডের মতো গড়ে তুলব কিনা, সেই বিকল্প সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ এর মধ্যে রয়েছে–একথা ভেবে এই বিকল্পকে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। একটি পর্যটন নির্ভর দেশ হিসেবে আমরা এই বিকল্প থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা অবশ্যই পেতে পারি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্ন বিচার করার সময় বাস্তব অবস্থা বিবেচনার বিষয়টি আমাদের কিছুতেই অবহেলা করলে চলে না। প্রথমত, আমাদের দেশ একটি ছোট দেশ, যার সাথে অনেকগুলি সীমানা যুক্ত হয়ে আছে। এই দীর্ঘ ও দুর্গম সীমান্ত এলাকাগুলিকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের নেই। এই অবস্থায় আমাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করা খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, সকল প্রতিবেশী দেশের শুভেচ্ছা আমাদের পেতেই হবে। এদের মধ্যে এমন শক্তিশালী গ্যারান্টারদের আমরা পাব কি–যারা নিজেদের শক্তিকে একত্র করে, যেকোনো রকম আক্রমণ থেকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদা নিশ্চয়তা দেবে? আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই–১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের রাজ্য স্বাধীন ছিল এবং তার ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, আমাদেরই প্রতিবেশী, যাদের সঙ্গে আমাদের বৈধ স্থিতাবস্থা চুক্তি ছিল, তারা আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। আমাদের রাজ্য আক্রান্ত হয়েছিল। *এরপর ৬ পাতায় দেখুন*

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৯ মূল্য ৫ টাকা

আমাজন থেকে সুন্দরবন–সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য বেপরোয়া আগ্রাসন

একমাস ধরে পুড়ছে 'পৃথিবীর ফুসফুস' অ্যামাজন। ফুসফুস, কারণ সারা বিশ্বের ২০ ভাগ অক্সিজেন আমাজন একাই সরবরাহ করে। এ আগুন এত বিশাল এলাকা জুড়ে যে, তা মহাকাশ থেকেও দেখা যাচ্ছে। প্রথমদিকে ব্রাজিল সরকার ও প্রচলিত গণমাধ্যমগুলো এ খবরটি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্রাজিল সরকার তেমন কোনো উদ্যোগই প্রথমদিকে নেয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে খবরটি প্রচার হয়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হওয়ায়, ব্রাজিল আগুন নিয়ন্ত্রণে কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। আমাজনের আগুন অনেকগুলো বিষয় নতুন করে বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করল। আমরা দেখলাম, পুঁজিবাদের মুনাফা লিপ্সার কাছে পরিবেশ আজ কত বিপন্ন! উন্নয়নের নামে আজ যেমন আমাজন বিপন্ন, তেমনি আমাদের দেশে বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনকে আজ ধ্বংসের আয়োজন চলছে। বিষয়টা তলিয়ে দেখা যাক।

এটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দাবানল ছিল না

ব্রাজিল সরকার বলছে, আমাজনে এ শুষ্ক মৌসুমে এমন আগুন লাগাটাই স্বাভাবিক, আর এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। খরার ফলে প্রাকৃতিক কারণে আমাজনে দাবানল সৃষ্টি হয়, যা স্বাভাবিক। কিন্তু এবার তেমন বিষয় ছিল না, জলবায়ু স্বাভাবিক ছিল। আমাজনের আগুন লাগার ঘটনাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে গবেষকরা বেশির ভাগ অগ্নিকাণ্ডকেই মানুষের সৃষ্ট বলছেন। ব্রাজিলের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্পেস রিসার্চ' (INPE) বলছে, এ বছর জুন পর্যন্ত আমাজনের ব্রাজিল অংশে ৭২ হাজার ৮৪৩টি অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, যা গত বছরের এসময়ের তুলনায় ৮৪ শতাংশ বেশি। জলবায়ু ও অস্বাভাবিক সংখ্যায় দাবানল দেখে বোঝা যায়, এটা প্রাকৃতিক নয়, মানুষের সৃষ্ট।

> প্রথমদিকে ব্রাজিল সরকার ও প্রচলিত গণমাধ্যমগুলো এ খবরটি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্রাজিল সরকার তেমন কোনো উদ্যোগই প্রথমদিকে নেয়নি

ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফার লোভ, রাষ্ট্র যার নাম দিয়েছে উন্নয়ন

আমাজনের ৬০ ভাগের অবস্থান ব্রাজিলে এবং তা ব্রাজিলের মোট আয়তনের ৪০ ভাগ। উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য আমাজন উজাড় করে কৃষিজমির বিস্তার, গবাদিপশুর খামার তৈরি, বৈধ ও অবৈধ লোহা, হীরে, সোনার খনি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য বন ধ্বংস করা হচ্ছে। গড়ে উঠছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত প্রকল্প। এবছর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির জন্য গবেষকরা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলসরানোর বৃহৎ ব্যবসায়ীপন্থী নীতিকেই দায়ী করছেন। এবছর জানুয়ারিতে ব্রাজিলের ক্ষমতায় এসে উগ্র ডানপন্থী বলসরানো ব্রাজিলের মন্দা কাটিয়ে ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন আমাজনের উন্নয়ন ঘটাবেন এবং আমাজনের আরও সংরক্ষিত এলাকা খনি, শিল্পকারখানা, কৃষি ফার্ম, গবাদি পশুর ফার্ম, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে উন্মুক্ত করবেন। এর পূর্ব থেকেই ব্রাজিলের মাংস ও সয়াবিন রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা আমাজনের জঙ্গল কেটে-পুড়িয়ে বিরাট পশুপালন খামার ও সয়াবিন চাষ করে আসছে বৈধ-অবৈধভাবে। উল্লেখ্য ব্রাজিল বিশ্বের অন্যতম সয়াবিন রপ্তানিকারক দেশ এবং বিশ্বের মোট মাংস চাহিদার ২০ ভাগ সরবরাহ করে। বলসরানো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দুই খাতের ব্যবসায়ী ও খনি মালিকদের জোরালো সমর্থন ছিল। বলসরানো সরকার এদের স্বার্থ রক্ষা করতেই পরিবেশ আইনের প্রয়োগ ও লঙ্ঘন তদারককারী ব্রাজিলের পরিবেশ সংস্থা ইবামা (IBAMA)-র ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। পরিবেশমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় রিচার্ড সেলসকে, যিনি মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে ব্রাজিলের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ব্রাজিলের পরিবেশ সংস্থার বরাদ্দ ২৩ মিলিয়ন ডলার কমিয়ে দিয়েছেন। পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের জরিমানা আদায়

৬ এর পাতায় দেখুন

ঝিলপাড় বস্তিতে আগুন

বস্তিবাসীদের কি এ শহরে ঠাঁই হবে না?

১৫ আগস্ট। কেবল সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে আকাশে। এরই মধ্যে অন্ধকার ভেদ করে দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। যে আগুন আকাশ আলোকিত করেনি, অন্ধকার নামিয়ে এনেছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের জীবনে–ঢাকার মিরপুরে। ঝিলপাড় বস্তিতে হাজার দুয়েক ঘর। রাস্তা থেকে প্রায় সাত-আট ফুট নিচু জমিতে কাঠ আর বাশের পাটাতনের উপর টিন দিয়ে তৈরি একতলা, দু'তলা ঘরগুলো। গা ঘেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। চার পাঁচ হাত ঘরে ৪/৫ জন করে মানুষ বসবাস করে। সরু রাস্তায় হাঁটার জায়গা পর্যন্ত নেই। ঘিঞ্জি পরিবেশ। ময়লা স্যাঁতসেতে। একটু দাঁড়ালেই দুর্গন্ধে টেকা দায়। অথচ এমন পরিবেশেই বছরের পর বছর হাজার হাজার মানুষ বাস করছে। আলো নেই, বাতাস নেই, পানি নেই; রোগ-শোক লেগে আছে সারা বছর। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতেও এরা এই পরিবেশে কেন আছে? এখানে এই বস্তিতে যারা থাকে বেশিরভাগই হয় পোশাকশ্রমিক, নয়তো গৃহকর্মী, রিকশাচালক কিংবা দিনমজুর। গ্রামে কাজ না পেয়ে অথবা কেউ নদী ভাঙনের শিকার হয়ে ভিটেমাটি হারিয়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছে বাঁচার তাগিদে। দিনমজুরি বা অন্য যে কাজই করুক, তাতে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড়ই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মাথা গোঁজার জন্য ভালো বাসা কীভাবে পাবে? তাই বাধ্য হয়ে বস্তির ঘিঞ্জি পরিবেশে আশ্রয় নেয়। কাজ করে কেউ হয়তো দু'টি পয়সা জমিয়ে ছিল ভবিষ্যতের

৬ এর পাতায় দেখুন

পিইসি পরীক্ষা বাতিল, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধসহ ৭ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলায় জেলায় শিক্ষা কনভেনশন

জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক সময়সূচি

ঢাকা: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সিলেট: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ময়মনসিংহ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

যশোর: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

চাঁদপুর: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

দিনাজপুর: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

গাইবান্ধা: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

চট্টগ্রাম: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বরিশাল: ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ফেনী: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

রংপুর: ৩ অক্টোবর ২০১৯

রোহিঙ্গা সংকট: সরকার সত্যিই সমাধান চায় তো?

গত আগস্ট মাসে ছিল রোহিঙ্গা গণহত্যা ও লাখে লাখে তাদের বাংলাদেশে শরণার্থী হওয়ার দুই বছর পূর্তি। এরই মধ্যে সেই আগস্ট মাসেরই ২২ তারিখে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য দ্বিতীয় দফা চেষ্টা করা হয়। গত বছরের নভেম্বরে প্রথম চেষ্টা করা হয়েছিল। দুটো চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, কেউ ফেরেনি। কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখন আগের চেয়ে এখন অনেক স্পষ্ট। এ আলোচনা প্রথমদিকের উত্তেজনার ধাপ পার করে এখন উদ্বিগ্নতার স্তরে পৌঁছেছে। ফলে এ সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে এই সংকট নিয়ে বিশ্লেষণ জরুরি, যাতে সচেতন মানুষ এ সম্পর্কিত একটা দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে পারেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী–বর্তমান পরিস্থিতি কী

আমরা দীর্ঘ আলোচনা ও বহু সংখ্যক উদাহরণে না ঢুকে এটা বলতে পারি যে, শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া একটা নৈতিক-মানবিক দায়িত্ব। আবার এই শরণার্থীরা আশ্রয়দাতা দেশ ও জনগোষ্ঠীর উপর একটা প্রভাবও সৃষ্টি করে। বাস্তবে অর্থনৈতিক প্রভাবের চেয়েও এর সামাজিক প্রভাব অনেক বেশি। বাংলাদেশে দু'বছর আগে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গণহত্যার প্রেক্ষিতে এক ধাক্কায় ৭ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী এসেছে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে আসা শরণার্থীদের সংখ্যা যোগ করলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১১ লক্ষাধিক। এরা বেশিরভাগ অংশই বাংলাদেশ-মিয়ানমার

সীমান্তে কক্সবাজার জেলায় অবস্থান করে। এই শরণার্থীদের প্রতিপালনের জন্য সরকার বিদেশ থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন, দেশি-বিদেশি অনেকগুলো সংস্থা এদের নিয়ে কাজ করছে। ফলে এটাই মূল সংকট নয়। এ অবস্থার পরিণতি কী হবে, সেটা নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা থাকে; সেটা তখন শরণার্থী, শরণার্থী ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার অধিবাসী এবং দেশের জনগণ–সবাইকেই চিন্তিত করে এবং একটা পরিবর্তন তখন সমাজের অভ্যন্তরে ঘটে যায়। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতা ও ক্ষমতার বাইরে থাকা সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী এই অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগায়। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য ভবিষ্যতের ভয়াবহ সংকটকে ডেকে আনে। যেহেতু রাষ্ট্রব্যবস্থাও পুঁজিবাদী, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলটিও সমস্যার সঠিক সমাধানের পরিবর্তে সুবিধাজনক সমাধান চায়, যাতে সেটা তার ক্ষমতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। ফলে প্রত্যেকেই তার মতো করে ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ও তা প্রচার করে। এতে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি চাপা পড়ে যায়, শরণার্থী ও আশ্রয়দাতাদের মধ্যে তৈরি হয় বৈরী সম্পর্ক। দু'বছর আগে রোহিঙ্গা শরণার্থীর ঢল যখন এদেশে ঢোকে, তখন গোটা দেশ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তখনও যে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো এ থেকে ফায়দা হাসিল করতে চায়নি তা নয়, কিন্তু দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে জাতীয় মনস্তত্বের একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন রোহিঙ্গা একটা গালি, বাজারে, রাস্তাঘাটে রোহিঙ্গা বলে গালিগালাজ করতে লোককে দেখা যায়। ফেসবুকে রোহিঙ্গাদের নিয়ে কেউ কোনো সহানুভূতিপূর্ণ লেখা লিখলে যে ধরনের মন্তব্য পোস্টের নিচে দেখা যায়, তা চিন্তিত না করে পারে না। ঘটনাকে ও তার পরিবর্তনের ক্রমকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধরতে না পারলে একদিনের ভালোবাসা আরেকদিন ঘৃণায় পরিণত হতে বাধ্য।

এরইমধ্যে বিএনপি রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে তাদের ১০ দফা সম্বলিত বক্তব্য হাজির করেছে। অনেক দলই সুষ্ঠু সমাধানের ব্যাপারে কথা বলছেন। কিন্তু এই বিষয়টা সর্বাগ্রে দেশের জনগণের সামনে আনা গুরুত্বপূর্ণ যে, শরণার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট কিছু সংকটকে কেন্দ্র করে গোটা শরণার্থীদের দোষী করা ও তাদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব তৈরি করা সংকটকে নিয়ে আরেকধরনের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই খেলা সরকার থেকে শুরু করে ক্ষমতাবহির্ভূত বিরোধী দলগুলো, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো সবাই খেলে যাচ্ছেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গণহত্যা দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা তৈরি করা, আবার দু'বছর পরে রোহিঙ্গারা আরাম পেয়ে গেছে বলে আঞ্চলিক উগ্রতা সৃষ্টি–একই রাজনীতির অংশ। দেশের সচেতন, শিক্ষিত মানুষের এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয়। এত বিরাট সংখ্যক

৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক: **শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী,** বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত। ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩।

ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org